প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০

প্রকাশিকা
শ্রীমতী অনিতা রায়চৌধুরী

প্রচ্ছদ
অজয় গুপ্ত

প্রচ্ছদ মুদ্রন
শ্রীসুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
ওয়েলনোন প্রিন্টার্স
১২৪ বি, রাজা রামমোহন রায় সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক
শ্রীতারাশঙ্কর চৌধুরী
জে, ডি প্রেস
৫২ / এ, কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

ছোটবেলা থেকে যিনি আমায় কোলেপিঠে করে মানুষ করেছেন

আমার সেই ঠাকুমা ৺কনকলতা চট্টোপাধ্যায়

ও

আমার গুরু অধ্যাপক ডঃ বরুণ কুমার চক্রবর্তী

শ্রী চরণেষু

পরিচায়িকা

শ্রীমান্ সৌগত চট্টোপাধ্যায় রচিত 'সাহিত্য-দর্শন' প্রবন্ধ গ্রন্থটি মোট ছ'টি প্রবন্ধের সংকলন। প্রবন্ধগুলিতে বিষয়বস্তুগত ঐক্যের সন্ধান মিলবে না, এই তরুণ প্রবন্ধিকের যে নানা বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা, তারই চমৎকার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় প্রবন্ধগুলির বিষয় নির্বাচনে। প্রথম প্রবন্ধটির বিষয় 'কবি কালিদাসের সাহিত্য নারী'। ইদানীং সংস্কৃত প্রায় পরিত্যক্ত, এমনকি সাহিত্য চর্চায় যাঁরা নিযুক্ত, তাঁরা যে পরিমাণে পাশ্চাত্য সাহিত্যের খবর রাখেন, বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় পাশ্চাত্য সাহিত্যের নানা প্রাসঙ্গিক বিষয়ে উল্লেখ করেন, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হতে দেখা যায় না। আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে অষ্টম শ্রেণীর পর আর সংস্কৃত অবশ্য পাঠ্য বিষয় নয়, অধিকাংশে কলেজেই সংস্কৃত পড়ানো হয় না, এমনকি যেখানে পড়ানো হয় সেখানেও গুটি কয়েকের বেশি ছাত্রছাত্রী হয় না। কারণ আমরা জেনে গেছি চাকুরীর বাজারে সংস্কৃতের দর তেমন নেই। আর যার বাজার দর কম বা নেই, তার চাহিদাও কম হবে হবে এত সহজ সত্য। কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও অধিকতর সত্য যে সাহিত্যের সংসারে আমরা শত চেষ্টাতেও সংস্কৃতকে অগ্রাহ্য করতে পারব না, পারা উচিত নয়। শ্রীমান্ সৌগত যে বিরল ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত রেখেছেন সংস্কৃতি সাহিত্যের অন্যতম প্রাণ পুরুষ সর্বকালের সর্বযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার কালিদাসের সাহিত্যে নারী চরিত্রগুলির চিত্রায়ণ সম্পর্কিত আলোচনায় তা সপ্রসংশ উল্লেখের দাবী রাখে। এই প্রবন্ধে একদিকে লেখকের সমগ্র কালিদাসের সাহিত্য পাঠের পরিচয় যেমন বিধৃত, তেমনি চরিত্রালোচনার উপযুক্ত রসদৃষ্টি ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিরও স্বাক্ষর রেখেছেন।

লোক সংস্কৃতি সংক্রান্ত একটি মাত্র প্রবন্ধ সংকলনটিতে স্থান পেয়েছে, সেটি হল সংকলনের দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'বাংলার ব্রতঃ নাটকীয় উপাদান'। আমাদের ব্রতকথাগুলির সাহিত্য গুণ, চিত্রকল্প, অভিপ্রায় এমনকি এগুলির সঙ্গে যাদু বিদ্যার সম্পর্ক নিয়ে অনেকেই আলোকপাত করেছেন। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথই প্রথম আমাদের ব্রতকথাগুলির সম্পূর্ণ ভিন্নতর একটি দিক নিয়ে আলোচনা করলেন—তা হল এগুলির নাটকীয় গঠন শৈলী। বর্তমান লেখক অবনীন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের ভাদুলী, মাঘমণ্ডল, তুষ তুষুলী অশ্বত্থপাতা কুলাই ঠাকুরের ব্রতগুলিতে প্রকাশিত নাট্য শৈলীর বিস্তারিত পরিচয় উপস্থিত করেছেন।

তৃতীয় প্রবন্ধটি আবার প্রথম দু'টি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অতুলনীয় বাণীগুলির কাব্যিক ও সাহিত্যিক গুণের পরিচয় নিয়ে অনেকেই আলোচনা করেছেন। তুলনা করা হয়েছে তাঁর উপদেশ দানের রীতির

সঙ্গে Bible এর Parable গুলির। কিন্তু বর্তমান লেখক ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণর অতুলনীয় বাণীগুলিতে অভিব্যক্ত বিজ্ঞান মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

'আধুনিক বাংলা কাব্য-কবিতায় কলকাতা' সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের আলোচনা। ইতি পূর্বে এই বিষয় নিয়ে একাধিক আলোচনা হলেও বর্তমান আলোচনাটির গুরুত্বকেও কিন্তু অস্বীকার করা যাবে না। বিভিন্ন কবি কলকাতাকে কি দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং কাব্যে তাকে রূপায়িত করেছেন তার সুন্দর আলোচনা রয়েছে প্রবন্ধটিতে।

'বাংলা ছোট গল্পে শিক্ষক' ও একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। শেষ রচনাটিই অবশ্য সর্ববৃহৎ। বিদ্যাসাগরের ধর্মভাবনা নিয়ে অনেকেই আলোচনা করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মনীষী বিদ্যাসাগর আস্তিক ছিলেন না নাস্তিক ছিলেন তার পক্ষে বিপক্ষে নানা মত। বর্তমান তরুণ লেখক নানা তথ্য দিয়ে এক বিশেষ অর্থে বিদ্যাসাগরকে 'ধার্মিক' বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। তাঁর যুক্তি ও ব্যাখ্যার সঙ্গে সকলেই যে একমত হবেন তা নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর বক্তব্যকে একেবারে যে উড়িয়ে দিতে পারবেন তাও নয়।

কথা বলে Morning Shows the day—সকাল দেখেই দিনটি কেমন যাবে বোঝা যায়। তেমনি শ্রীমান্ সৌগতের প্রাবন্ধিক রূপে যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা, তা তাঁর প্রথম এই বক্ষ্যমান গ্রন্থটি থেকেই প্রতিপন্ন হয়। জীবন সম্পর্কে তাঁর উদার ও প্রসন্ন দৃষ্টিভঙ্গী, সূক্ষ্ম রসবোধ, সহজ সরল হয়েও ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত ভাষার অধিকারী বর্তমান লেখকের প্রথম গ্রন্থটিকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং রসিক পাঠকের দ্বারা গ্রন্থটি আদৃত হবে এই আশা পোষণ করছি।

ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী
বিভাগীয় প্রধান, লোকসংস্কৃতি বিভাগ,
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

নিবেদন

'সাহিত্য দর্শন' নামক বর্তমান গ্রন্থটিই আমার প্রথম গ্রন্থ। এতে সংকলিত প্রবন্ধের সংখ্যা মোট ছয়টি। তার মধ্যে দুটি ইতিমধ্যেই ভিন্ন দুই পত্রিকায় প্রকাশিত।

বর্তমান গ্রন্থটির রচনার ক্ষেত্রে যাঁরা আমায় বিশেষ ভাবেই অনুপ্রাণীত করেছেন ও প্রয়োজন বোধে নির্দেশ ও উপদেশ দিয়ে বাধিত করেছেন তাঁদের মধ্যে আমার পিতৃদেব শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, আমার অধ্যাপক ডঃ উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ বরুণ কুমার চক্রবর্তীর নাম বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে ডঃ চক্রবর্তীই এ'ব্যাপারে আমায় প্রথম পরামর্শ দেন। তাঁর নিরন্তর স্নেহ-শাসন-উপদেশ না পেলে এ'গ্রন্থ আদৌ প্রকাশিত হত কিনা জানি না। তাঁর কাছ থেকে আমার নেওয়ার শেষ নেই।

এছাড়াও যাঁরা আমায় প্রয়োজনীয় বইপত্র দিয়ে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, অনির্বান মান্না, পল্লব মুখোপাধ্যায়, মধু মিত্র, মানস ঘোষ, সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, অমিত সাহা, ইন্দ্রনীল সিন্‌হা, ছন্দক সাউ, অভিজিৎ দে, শম্ভু দাস, সৌরভ চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত চক্রবর্তী ও নাট্যকর্মী রণবীর পাঠকের নাম বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য। উল্লেখযোগ্য শ্রীমতী স্বাতী ঘোষ ও পর্ণা মুখোপাধ্যায়ের নামও। এঁদের কাউকেই আমি শুধু ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করতে চাই না।

কিন্তু এই বই দেখলে আজ যিনি সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হতেন আমার সেই সদ্যপ্রয়াতা ঠাকুমা ৺কনকলতা চট্টোপাধ্যায় আজ আর ইহলোকে নেই। আমার প্রতিটি কাজের পেছনেই ছিল তাঁর অদম্য উৎসাহ ও বিশেষ সমর্থন। তাঁর স্বর্গত আত্মা অলক্ষ্য থেকে আমায় আশির্বাদ করুণ এই প্রার্থনা জানাই। অলমিতি বিস্তরেণ।

বিনীত
লেখক

বিষয়সূচী

কবি কালিদাসের সাহিত্যে নারী

কালিদাসের নারী চরিত্রগুলি প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। রাজ্ঞী, দূতী এবং প্রেমিকা। অনেকেই অভিযোগ করেছেন যে, কালিদাসের নারী ভবভূতির সীতার মত দেবী নন, মূলতঃ 'ভোগ্যা' রূপেই সাহিত্যের আসরে তাঁদের আবির্ভাব। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে 'ভোগ্যা' কথাটি সাধারণতঃ নিকৃষ্ট অর্থেই ব্যবহৃত। কালিদাসের নারী আদৌ তা নন। তাঁরা প্রেমের মাধ্যমে সম্মানিত, পরিণতিতে সে প্রেমও আবার সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং "ভোগ্যা"র পদবাচ্যা তাঁরা কখনই হতে পারেন না।

তবু কামসম্ভবা প্রেমিকা তাঁরা সেকথা সত্য। যদিও তাঁর 'রঘুবংশম্' কাব্যের সীতা অনেকটা ভবভূতির সীতার মতই। তাঁকে আজন্মা বিশুদ্ধা রমণী রূপেই মহাকবি অঙ্কন করেছেন। কিন্তু কালিদাসের অন্যান্য কাব্যে অথবা নাটকে ঠিক এমনটি দেখা যায় না। যায় না এই কারণেই যে, ঐ সবের বিষয়বস্তুই আসলে এইরূপ নারী প্রতিমা অঙ্কনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই নায়িকারা কোন প্লেটোনিক লাভের পরিমণ্ডলে নয়, একান্ত-ভাবে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি চরিতার্থের কামনাতেই সেখানে নায়কের সঙ্গ কামনা করেছেন। কুমারসম্ভবে দেখি পার্বতী প্রথমে দৈহিক প্রেমের আকর্ষণেই দেবাদিদেবের আরাধনায় ব্রতী হয়েছেন। ফলে যৌবনলীলার চাঞ্চল্যই সেখানে "সর্বময় হয়ে দেখা দিয়েছে"। কিংবা শকুন্তলমেও দেখি নায়িকা শকুন্তলা দুষ্মন্তকে লাভ করতে চেয়েছেন প্রচণ্ড কামাবেগের দ্বারা চালিত হয়েই। তাই যে কণ্ব মাতৃপরিত্যক্তা তাঁকে আশ্রম সান্নিধ্যে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, যিনি তাঁকে নিজের পুত্রীর মতই স্নেহ করতেন, যিনি তাঁরই প্রতিকূল দৈবের প্রশমনের চেষ্টায় সুদূর প্রভাসতীর্থে গমন করেছিলেন, শকুন্তলা তাঁর গান্ধর্ব্য বিবাহে অগ্রসর হবার আগে সেই কণ্বমুনিরও একটা মতামত নেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করলেন না। অপর নাটক বিক্রমোর্বশীয়মেও দেখি নায়িকা উর্বশী স্বর্গে 'লক্ষ্মীস্বয়ংবর' নাটকে অভিনয় করাকালীন ভুলবশতঃ কামাবেগের তাড়নায় রাজা পুরূরবার নামই উচ্চারণ করে বসেন। মেঘদূতে কাব্যের নায়িকা যক্ষ-পত্নীর চরিত্রটিও এর কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নয়। তাঁরও প্রেমের মূলে ছিল ঐ একান্ত জৈবিক চাহিদাই। তাই মেঘদূতের প্রতিটি শ্লোকের মধ্য দিয়েই আমরা জৈবিক কামনার পরোক্ষ প্রকাশ লক্ষ্য করি। বিশিষ্ট সমালোচকেরও সিদ্ধান্ত, মেঘদূত কাব্য যদিও যক্ষ দম্পতির বিরহকে কেন্দ্র করেই রচিত, তথাপি বিরহেই তার শেষ হয়নি। এই কাব্যে বিরহের মুখ্য উদ্দেশ্যই হল কামনার বহ্নিতে ইন্ধন দান, তাকে আরও সুরক্ষিত করে তোলা।

তবে একথা সত্য যে কালিদাসের অধিকাংশ প্রেমিক-প্রেমিকারা কামসম্ভবা হলেও তাঁরা ছলনাময়ী প্রেমিকা নন। তাঁরা সকলেই পতিগতপ্রাণা ভারতীয় রমণী। এমনকি অনেক সময়ে এমনও হয়েছে যে নায়কেরা তাঁদের ভুল বুঝেছেন কিন্তু তবুও তাঁরা অপেক্ষা করেছেন। নায়ককে পুনরায় ফিরে পাবার জন্য ঐকান্তিক তপস্যায় হয়েছেন ব্রতী। যেমন 'শকুন্তলম' নাটকেই সন্তানসম্ভবা শকুন্তলা রাজা দুষ্মন্তের অতবড় তিরস্কারবাণী শ্রবণে (কোকিলেরা বিচরণের শক্তি জন্মানোর পূর্বে যেমন নিজ সন্তানদের অন্যপক্ষী (কাক) দ্বারা লালন পালন করিয়ে নেয়, তেমনি এই মহিলাও তাঁর ভাবী সন্তানকে মহারাজের বলে চালিয়ে দিতে চাইছেন।) ক্ষণিকের জন্য উত্তেজিতা হলেও শেষ অবধি বিরহ-ব্রতচারিণীর বেশে একবেণীধরা হয়ে প্রোষিতভর্তৃকার জীবন বেছে নিয়েছেন। ভুলেও স্বামীকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন নি। আসলে যথার্থ প্রেমের প্রতি তাঁর আস্থা অবিচল ছিল বলেই তিনি মনে করেছিলেন যে মিলন তাঁদের একদিন হবেই। হতে বাধ্য।

'রঘুবংশম' কাব্যেও দেখি, মহাকবি কালিদাস যেন সীতাকে প্রথমাবধিই সাধ্বীরূপে অঙ্কন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। যেমন শ্রীরামচন্দ্রই একবার বলেছেন, "সাধ্বী যথার্থ বলিতেছি, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র লক্ষ্মণ যেমন যুদ্ধে খরদূষণ প্রভৃতির বিনাশপূর্বক আমি প্রতিনিবৃত্ত হইলে তাহার হস্তে গচ্ছিত আমার লক্ষ্মীরূপিণী তোমাকে প্রত্যার্পণ করিয়াছিল, আজ পিতৃসত্য পালন-পূর্বক আমি ফিরিয়া আসিতেছি। তাই অক্ষত স্বভাব ভরতও এতদিন তাঁহার হস্তে ন্যস্তা রাজলক্ষ্মীকে আমার হাতে ফিরিয়া দিতে আসিতেছে। সাধ্বী, সাধুপ্রকৃতির ভরত এতকাল রাজলক্ষ্মীর ছায়া পর্যন্ত স্পর্শ করে নাই।"

আবার সীতা যে কলঙ্কিনী নন, শুধুমাত্র লোকাপবাদকে খণ্ডন করার জন্যই যে তাঁর সীতা পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত, সেকথা বোঝাতে গিয়েও তিনি বলেছেন—

অবৈমি চৈনামনঘেতি কিন্তু লোকাপবাদ বলবান্ মতো মে।
ছায়া হি ভূমেঃ শশিনো মলত্বেনারোপিতা শুদ্ধিমতঃ প্রজাভিঃ॥

এই সাধ্বী বিশেষণটি আমরা মেঘদূতের কল্পিত নায়িকা যক্ষপত্নীর ক্ষেত্রেও আরোপ করতে পারি। কারণ স্বামীগত প্রাণা ভারতীয় আদর্শের প্রতিফলন তাঁর চরিত্রেও লক্ষ্য করা গেছে। কবিকল্পনায় তিনিও স্বামী চিন্তা করে কালাতি-পাতে ব্রতী। যক্ষপতি কুবেরের প্রাসাদের উত্তরদিকে শঙ্খপদ্ম চিহ্নিত তাঁর গৃহ। কিন্তু গৃহস্বামীর বিচ্ছেদ বেদনায় সে সমস্ত ভবনই যেন ছায়ামূর্তি "ক্ষামচ্ছায়ং ভবনমধুনা মদ্বিযোগেন নূনম"। তাই কত আদর করে তিনি খাঁচার সারিকাটিকে তার নাম জিজ্ঞাসা করেন এবং বীণাটি কোলে নিয়ে যক্ষের নাম সমেত স্বরচিত

গান গেয়ে যান। তবেই না মেঘ এসে তাঁকে একদিন জানিয়ে দিয়ে যায় মিলন তাঁদের একদিন হবেই। সুখ দুঃখ মানুষের চিরকাল সমান যায় না।

আবার 'কুমারসম্ভব' কাব্যেও দেখি পার্বতীকে প্রথমাবধিই সাধ্বীরূপে অংকন করতে সচেষ্ট হয়েছেন মহাকবি কালিদাস। কেননা মহাদেবকে পতিরূপে পাবার জন্য তাঁরও তপস্যার শেষ নেই। শেষপর্যন্ত তিনি হলেন পঞ্চাগ্নি তপস্যায় ব্রতী। তাই 'স্বামী জ্ঞান, স্বামী ধ্যান, স্বামী চিন্তামণি' হওয়ায় এঁরা সকলেই সাধ্বী রমণী। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে, একমনে এই স্বামী চিন্তা করার কারণেই অভিশপ্তা হতে হয়েছিল শকুন্তলাকে। কিংবা 'বিক্রমোর্বশীয়ম্' নাটকের নায়িকা উর্বশীকে। তবে একটা কথা, মালবিকা অথবা উর্বশীকে মহাকবি তেমনভাবে অংকন করেননি। ঠিক যেমনটি করেছিলেন সীতা অথবা অলকাপুরীর যক্ষপত্নীকে, অবশ্য সে সুযোগও সেখানে তৈরী হয়নি, সেকথাও সমানভাবে সত্য।

কালিদাসের নায়িকারা সকলেই অসাধারণ রূপবতী। দৈহিক সৌন্দর্যে তাঁরা অতুলনীয়া। তাই অনসুয়া কৃত অক্ষয় অঙ্গরাগের শোভায় জ্যোতির্ময়ী জানকীকে দেখেই মহাকবির মনে হল, রামচন্দ্র বুঝিবা আগুনের মাঝে দণ্ডায়মানা তাঁর বিশুদ্ধা চরিত্রা পত্নীকে অযোধ্যাবাসীদের সামনে প্রদর্শন করছেন—

স্ফুরৎ প্রভামণ্ডলমানুসূয়ং সা বিভ্রতি শাশ্বতমঙ্গরাগম্।
ররাজ শুদ্ধেতি পুনঃ স পুর্য্যৈ সন্দর্শিতা বহ্নি-গতের ভর্ত্রা॥

কিংবা "কুমারসম্ভব' নাটকে পার্বতীর রূপবর্ণনা—

সর্বোপমাদ্রব্য সমুচ্চয়েন যথা প্রদেশং বিনিবেশিতেন।
সা নির্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্নদেকত্র সৌন্দর্য দিদৃক্ষয়েব॥

পঞ্চাগ্নি তপস্যাকালীন তাঁর রূপের ক্রমবিবর্তনটিও এখানে লক্ষণীয়, যেখানে জলাশয়েব কমলকুল তুষারবর্ষণে অন্তর্হিত হয়ে গেলেও আকণ্ঠ জলে নিমজ্জিতা পার্বতী নিজেই নিজের শোভা বর্ধন করে চলেছেন। মহাকবির অপূর্ব উপমায়—

মুখেন সা পদ্মসুগন্ধিনা নিশি, প্রবেপমানাধরপত্রশোভিনা।
তুষারবৃষ্টিক্ষত—পদ্মসম্পদাং, সরোজসন্ধানমিবাকরোদপাম্॥

তাই শেষ অবধি পার্বতীকে প্রকৃত সুন্দরী রূপে দর্শন করেই মহাকবি বললেন—"হে পার্বতী! আবহমানকাল ধরে প্রবাদ চলে এসেছে, সুন্দর রূপ কখনও পাপকাজে লিপ্ত হয় না। কথাটা যে সত্যি তা তোমায় দেখে বুঝতে পারছি। হে আয়তনয়না! তোমার চরিত্র তপস্বীদের কাছেও শিক্ষণীয়।"

আর এভাবেই কালিদাসের নায়িকারা হয়ে ওঠেন সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা।

বিশ্বভুবন আলো করা এক অপূর্ব স্বর্গীয় মাধুরী। শকুন্তলা দর্শনেও তাই অভিভূত কালিদাস বলতে পারেন, "সৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে, ধাতুবিভত্বনুশ্চিত্য বপুশ্চ তস্যাঃ।

তাঁর রূপের ক্রমবিবর্তনটিও এখানে লক্ষণীয়। প্রথমে তিনি উদ্ভিন্নযৌবনা কিশোরী। নায়ক দুষ্মন্তের চোখে সামান্য বল্কল পরিহিতা হয়েও তিনি নায়কের মনোহরণে সমর্থা। কালিদাসের ভাষায়—

"সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং।
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি ॥
ইয়মধিক-মনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী।
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতিনাম্ ॥

কখনও নায়ক দুষ্মন্তের মনে হয়েছে শকুন্তলা যেন একটি অনাঘ্রাত পুষ্পের ন্যায়। না জানি বিধি এই মনোহর রূপ ভোগ করার জন্যে কার কাছে উপস্থিত হবেন। আবার দ্বিতীয়ে তিনি পতিবিরহে কাতরা যুবতী। পরিধানে তাঁর ধূলিধূসর বসনভূষণ, নিয়ম পালনে তিনি ম্লানমুখী, একবেণীধরা। পূর্বের কামার্ত রূপও এখানে অন্তর্হিত—

বসনে পরিধূসরে বসনা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণীঃ।
অতি নিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি ॥

আবার কালিদাস যখন তাঁকে দেখেছেন মাতৃরূপে তখন সেই রূপেও মিশেছে এক আশ্চর্য পবিত্রতা। পুত্রের প্রতি তাঁর একইসঙ্গে মাতা ও পিতার ভূমিকা। অবশেষে তাঁকে আমরা পাই ক্ষমাশীলা রূপে, যেখানে নায়ক দুষ্মন্তের সকল অপরাধকেই তিনি মার্জনা করলেন। চোখের জলে মিলনও হল সম্পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

শান্তিরূপিণী এ মুরতী তব
অতি অপূর্ব সাজে
অনল রেখায় ফুটিয়া উঠিযে
অনন্ত নিশি মাঝে।

'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকেও নৃত্যকালীন অবস্থায় মালবিকার রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা নায়ক অগ্নিমিত্রের কণ্ঠেই শুনেছি—"আহা! কি রূপ! প্রতিটি অঙ্গে যেন তা উছলে পড়ছে। টানা টানা চোখ, শরৎকালের চাঁদের মতো মুখ, কাঁধ থেকে নেমে আসা দুটি বাহু, উন্নত স্তনদ্বয়ে পরিপূর্ণ বক্ষোদেশ, মার্জিত পার্শ্বদেশ, হস্তমুষ্টিতে আবদ্ধযোগ্য মধ্যপ্রান্ত, প্রশস্ত নিতম্বযুক্ত জঘন, বক্র অঙ্গুলী যুক্ত পদদ্বয়। মনে হচ্ছে যেন নৃত্যগুরুর ইচ্ছা অনুযায়ীই শরীরটি তৈরী হয়েছে।"

অথবা 'বিক্রমোর্বশীয়ম্' নাটকে উর্বশীর রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে পাই—

'অলংকারের যে অলংকার, সাজসজ্জার যে সাজসজ্জা, উর্বশীর কলেবরও তেমনি উপমান পদার্থের উপমান স্থানীয়। অর্থাৎ চাঁদ তাঁর মুখের মতো, পদ্ম তাঁর চোখের মতো।"

এই সৌন্দর্য রয়েছে মেঘদূতের নায়িকারও। "তিনি তিলোত্তমা নারী। কবির মানস প্রতিমা। পার্থিব সৌন্দর্যের শেষপ্রান্তে তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। কাব্যটির গড়ন তাই পিরামিডের মত। তার পাদদেশে ভৌগোলিক বিবরণ, মধ্যভাগে অলোকা আর চূড়ায় অধিষ্ঠিতা এক নারী মূর্তি।" তিনি সকল সৌন্দর্যের এক সারভূত প্রতিমা। মহাকবি তাঁকে যেন খোদাই করে নির্মাণ করেছেন—

তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী।
মধ্যে শ্যামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ ॥
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং।
যা তত্র স্যাদ্ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ ॥

কবি বুদ্ধদেব বসু এর অনুবাদ করে বলেছেন—

তন্বী শ্যামা আর সূক্ষ্ম-দন্তিনী, নিম্ননাভি, ক্ষীণমধ্যা
জঘন গুরু বলে মন্দ লয়ে চলে, চকিত হরিণীর দৃষ্টি,
অধরে রক্তিমা পক্ক বিম্বের, যুগল স্তনভারে ঈষৎনতা,
সেথায় আছে সেই, বিশ্বস্রষ্টার প্রথম যুবতীর প্রতিমা।

তবু কালিদাসের বিরুদ্ধে মস্ত অভিযোগ হল এই যে—তিনি নারীর রূপ-বর্ণনায় নাকি বড় বেশী অশ্লীলতা প্রকাশ করে ফেলেছেন। তাঁর সম্ভোগপ্রিয়তা নাকি বড় বেশী। কিন্তু এই অভিযোগটি আমরা পুরোপুরি মেনে নিতে পারি না। পারি না এই কারণেই যে কালিদাস নারীর রূপ বলতে বুঝেছিলেন সুন্দর সুন্দর বস্তু বা উপাদানকে। তাঁর কাছে তাই সৌন্দর্য আকৃতি বিশেষের ধর্ম, যা আকৃতিটিকে চারুত্ব ও রম্যতাবিশিষ্ট করে তোলে। আর এই সৌন্দর্য যেমন আকৃতিগত বা সমগ্রের সামঞ্জস্যের মধ্যে নিহিত থাকে তেমনি তার প্রতিটি অংশের সৌন্দর্যের ওপরেই নির্ভর করে বেশী। সমালোচকের এই মন্তব্য যথার্থ। তাই মালবিকা, যক্ষপত্নী কিংবা অন্যান্য নায়িকাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনায় কবির কতই না আগ্রহ।

অবশ্য যদিও একে অশ্লীলতা বলা যায় তবুও তা যে সকল নায়িকার রূপ-বর্ণনার ক্ষেত্রেই অপ্রাসঙ্গিকভাবে প্রযুক্ত হয়েছে তা নয়। বিশেষ করে শকুন্তলার রূপাঙ্কন ত যুক্তিধর্মিতাকেই অবলম্বন করেছে অধিকভাবে। যেমন প্রথমে তিনি উদ্ভিন্ন যৌবনা কিশোরী। সমালোচক বলেন, তা না হলে নায়ক দুষ্মন্তের পক্ষে শকুন্তলার রূপজমোহে আকৃষ্ট হবার কোন কারণই থাকত না। কিন্তু লক্ষণীয় সেক্ষেত্রে তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোন বর্ণনাই মহাকবি দিলেন

না, কেননা সেসব তখনও মহারাজের দৃষ্টির সম্পূর্ণ আড়ালে। আবার পঞ্চমাঙ্কে লাবণ্যময়ী নায়িকার লাবণ্যময়তার রূপাঙ্কনের যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মহাকবি দুষ্মন্তকে দিয়ে শকুন্তলাকে পরস্ত্রী ভাবিয়ে এবং পরস্ত্রীর রূপ-মাধুরীতে আকৃষ্ট হওয়া যে পাপ এবং বিধিচিন্তার উদ্ভাবন ঘটিয়ে সে'পথেই যাননি। আর সপ্তমাঙ্কে শকুন্তলার বিরহীরূপের বর্ণনায় ত মহাকবির কোন তুলনাই হয় না। বাস্তবিকই সমালোচকের এই কথা যথার্থ। অবশ্য 'কুমারসম্ভব' কাব্যে পার্বতীর রূপবর্ণনার ক্ষেত্রেও আমাদের এই বক্তব্য প্রযোজ্য। কেননা সেখানেও মদনের আকস্মিক আবির্ভাবে পার্বতীর যৌবন-লীলার চাঞ্চল্য সবিস্তারে বর্ণিত হলেও তা কোন সংকীর্ণ সীমায় সর্বময় হয়ে ওঠেনি। মহাকবি সম্ভোগের কবি বলে পরিগণিত হলেও এখানে যে সংযম রক্ষা করেছেন, তা বেশ ভালভাবেই বোঝা যায়। কাব্যটিতে পার্বতীর তপস্যাময়ী মূর্তিটিকেও লক্ষ্য করে বলা যায় পূর্বের আদিরস যেন সবটাই তাঁর কাছে বাহ্য আবরণ মাত্র। আরো মনে হয় পরবর্তী ঐ রূপটিকে উজ্জ্বল করার কারণেই বুঝিবা পূর্ববর্তী ঐ বর্ণনার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং এ সব নাটকের অথবা কাব্যের নায়িকার রূপবর্ণনায় অশ্লীলতা প্রকাশ পেলেও পরিণতির রসাস্বাদনে তা পাঠকের কাছে আদৌ অরুচিকর ঠেকে না। তবে একথা ঠিকই যে আমাদের এই বক্তব্য সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো প্রযোজ্য নয়।

কালিদাস সৃষ্ট কোন কোন নারী চরিত্রের আর একটি স্বাভাবিক গুণ হল 'অরণ্যপ্রিয়তা', গভীর স্নেহে তাঁদের তরুরাজি পালন। যেমন শকুন্তলমের নায়িকা শকুন্তলাকে একেবারে প্রথমাঙ্কেই দেখা গেছে, তিনি আশ্রমের তরু-রাজির আগায় জলসেচনে ব্রতী, শুধু তাই নয় এই নাটকেরই পঞ্চমাঙ্কের বিদায় দৃশ্যে শকুন্তলার পালকপিতা কণ্বের মুখেই আমরা জানতে পেরেছি, বৃক্ষের গোড়ায় জলসেচন না করে শকুন্তলা কখনো জলপান করেননি, মহিলা হওয়া সত্ত্বেও তাদের পুষ্পপল্লব চয়ন করে নিজে কখনো সাজেননি, এমনকি তাদের গাছে ফুল এলে শকুন্তলা উৎসব আনন্দেই মেতে উঠেছেন। তাই পতিগৃহে যাত্রার প্রাক্কালে কণ্বমুনি শকুন্তলাকে বিদায় জানাবার আগে সেই অরণ্য প্রকৃতিকেই বলতে বাধ্য হয়েছেন "সেই শকুন্তলা আজ পতিগৃহে যাত্রা করছে, তোমরা অনুমতি দাও।"

আবার "কুমারসম্ভব" কাব্যেও গাছের আগায় জলসেচন করতে দেখা গেছে পার্বতীকে। তপস্যার শ্রেষ্ঠ আদর্শ হিসেবে গাছকেই তিনি মূল মন্ত্র করেছেন। পরবর্তীকালে তাঁর সন্তান কার্ত্তিকেয় পর্যন্ত এই স্নেহকে বিন্দুমাত্র কমাতে পারেননি। কবির অনবদ্য উপমায় পার্বতীর সেই চরিত্রটি—

অতন্দ্রিতা না স্বয়মেব বৃক্ষকান্ ঘটস্তনপ্রস্রবণৈর্ব্যবর্দ্ধয়ৎ।
গুহোঽপি যেষাং প্রথমাপ্তজন্মনাং, ন পুত্রবাৎসল্যমপাকরিষ্যতি ॥

কিন্তু কালিদাসের সাহিত্যের নারীরা কেবল কোমলপ্রাণাই নন, প্রয়োজনে তেজস্বিনী রূপেও তাঁরা আত্মপ্রকাশ করতে জানেন। তাই অভিজ্ঞান শকুন্তলমের নায়িকা শকুন্তলাকে নায়ক দুষ্মন্ত যখন প্রত্যাখান করলেন তাঁর চরিত্রে কালিমালেপন করেন, তখন শকুন্তলাও রাজাকে শোনাতে ভোলেননি—

"অনার্য আত্মনো হৃদয়ানুমানেন কিল সর্বপ্রেক্ষসে।
ক ইদানীমন্যো ধর্মকঞ্চুক-প্রবেশিন স্তৃণ-ছন্ন কুপোপমস্য
তবানুকৃতিং প্রতিপত্স্যতে।"

অথবা, "সুষ্ঠুতাবত্ অত্র স্বচ্ছন্দচারিণী কৃতাস্মি।
যাহমস্য-পুরুবংশ প্রত্যযেন মুখ-মধো হৃদয়-বিষস্য
হস্তাভ্যাসমুপগতা।"

"রঘুবংশম্" কাব্যেও রামচন্দ্র কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা সীতাকে বলতে শোনা গেছে—

সাহং তপঃ সূর্য-নিবিষ্ট দৃষ্টিরুদ্ধং প্রসূতেশ্চরিতুং যতিষ্যে।
ভূয়ো মে জননান্তরেঽপি তমেব ভর্ত্তা ন চ বিপ্রোয়গঃ ॥

কিন্তু এ প্রতিবাদ শকুন্তলার মত নয় বরং ভবভূতির সীতার সঙ্গেই তাঁর তুলনা করা সার্থক। সতীত্বের গর্বই যে তেজস্বিতার মূল। ভবভূতির সীতাও এইসময়ে লক্ষ্মণকে উদ্দেশ করে রামচন্দ্রকে বলবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন—

জানা সি চ যথা শুদ্ধা সীতা তত্ত্বেন রাঘবঃ।
ভক্তা চ পরয়া যুক্তাহিতা চ তব নিত্যশঃ।
অহং তক্তা চ তে বীর অবশো ভীরুণা বনে
যচ্চতে বচনীয়ং স্যাদবাবাদঃ সমুত্থিত
ময়া চ পরিহর্তব্য ত্বং হি মে পরমাগতি

* * * * * *

যত্তু পৌরজনে রাজন্ ধর্ম্মেন সমবাপ্নুয়াৎ
অহন্তু নানুশোচয়াম স্বশরীরংনরর্ষভ
যথাপবাদঃ পৌরাণাং তথৈব রঘুনন্দন
পতির্হিদেবতা নার্যাঃ পতির্বন্ধু পতির্গুরুঃ
প্রাণৈরপি প্রিয়ং তস্মাৎ ভর্ত্তুঃ কার্যং বিশেষতঃ।

কালিদাসের নারীচরিত্রগুলির আর একটি স্বাভাবিক দিক হল প্রকৃতির সঙ্গে তাঁদের অবিচ্ছেদ্যতা। সত্য কথা বলতে কি নারী ও প্রকৃতির মধ্যে এমন একটি অবিচ্ছেদ্যতা আর কোন কবিতেই দেখা যায় না। বলতে গেলে কবির

তপোবনপ্রিয়তাই তাঁকে খাঁটি ভারতীয়ত্বে উত্তীর্ণ করেছে। তাঁর সাহিত্যে নারী ও প্রকৃতি যেন মিলে মিশে একাকার। তাই এ'প্রকৃতি জড় প্রকৃতি নয়। সে হল চৈতন্যময়ী। মানব-মানবীর লীলায়িত জীবনচক্রের মাঝে সে হল নিত্যসহচর। 'রঘুবংশম্' কাব্যেও তাই সীতাকে দেখে কালিদাস এমন· ভাবে বলতে পেরেছেন—

অসৌ মহেন্দ্রাদ্বিপদান্—গন্ধিস্ত্রীমার্গগা—বীচিবিমর্দশীতঃ।
আকাশ-বায়ুর্দিন যৌবনোত্থানাচামতি সেদ-লবান মুখেতে ॥

'কুমারসম্ভব' কাব্যেও পার্বতীকে দেখে কালিদাসের মনে হয়েছে, তিনি বুঝিবা শরৎ প্রকৃতির বুকে শোভিতা কাশফুলের সঙ্গেই তুলনীয়া। মৃণালের মত অতিকোমল দেহলতাকে তিনি ব্রত পালনের মাধ্যমে যেভাবে দিনরাত পীড়ন করে চলেছেন, তাতে সত্যই মনে হয় সেই তপস্যা বুঝিবা কঠিন সাধনায় নিজেদের উৎসর্গকারী তপস্বীদের থেকেও শ্রেষ্ঠ।

আবার শকুন্তলমের নায়িকা শকুন্তলাও এভাবে প্রকৃতির সঙ্গে একেবারে একাত্ম বিজড়িত। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই লিখেছেন, "কালিদাস তাঁহার নাটকে যে বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাকে বাইরে ফেলিয়া রাখেন নাই, তাহাকে শকুন্তলার চরিত্রের মধ্যে উন্মেষিত করিয়া তুলিয়াছেন।......লতার সহিত ফুলের যেরূপ সম্বন্ধ, তপোবনের সহিত শকুন্তলারও সেইরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ।"

কিংবা অন্যত্র লিখেছেন,

"শকুন্তলা মিরান্দার মত স্বতন্ত্র নহে, শকুন্তলা তাহার চতুর্দিকের সহিত একান্তভাবে বিজড়িত। তাহার মধুর চরিত্রখানিও অরণ্যের ছায়া ও মাধবী-লতার পুষ্পমঞ্জরীর সহিত ব্যাপ্ত ও বিকশিত। পশু-পক্ষীদের অকৃত্রিম সৌহার্দ্যের সহিত নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট।"

তাই আশ্রমের সহকার একটি তরুর সঙ্গে শকুন্তলার রাগবদ্ধ দৃষ্টিতেও সখীরা একদিন প্রত্যক্ষ করেছিল, ভাবী বরের সঙ্গে তাঁর মিলন সম্ভাবনার উজ্জ্বল আশ্বাসকে। কিংবা শকুন্তলার কাছে তাঁর সখীরাই একদিন জানতে চেয়েছিল নবমল্লিকার কথা সে ভুলে গেছে কিনা। উত্তরে শকুন্তলা জানিয়েছিল —"আত্মানং খলু বিস্মরিষ্যামি।" প্রকৃতির সঙ্গে নারী বাঁধা পড়ে আছে এমনই এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে। আবার নাটকের তৃতীয়াঙ্কের প্রথমেই দেখি শকুন্তলার মদনতাপ প্রশমনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে মৃণাল, পদ্মপত্রে, রচিত হয়েছে শয্যা, এমনকি প্রেমপত্রটিও তাঁর রচিত হয়েছে পদ্মপত্রে নখের আঁচড়ে রচনা করে। আবার চতুর্থাঙ্কের বিদায়দৃশ্যেও সমগ্র বনভূমি শকুন্তলাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠেছে। যেন বলতে চেয়েছে "যেতে নাহি দিব।" প্রিয়ংবদা তাই যথার্থই বলেছে—শকুন্তলাই কেবল তপোবনের বিরহে কাতর

নয়, সমগ্র তপোবনও শকুন্তলার বিরহে কাতর। সমগ্র প্রকৃতিই এখানে সমদুঃখভাবম্—

"ন কেবলম্ বিরহকাতরা সখী এব, ত্বয়া উপস্থিবিয়োগস্য
তপোবনস্যাপি সমাবস্থা দৃশ্যতে।"

তাই কুশক্ষত যে মৃগটিকে শকুন্তলা লালন পালন করেছিলেন এবং সুস্থও করে তুলেছিলেন তাঁর মাতৃত্বের অপার মমতায়, সেও শেষ অবধি শকুন্তলার বস্ত্রাঞ্চল টেনে ধরেছে। তাই প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ, তার প্রতি সোদর স্নেহ যে পরিণতিতে এত করুণ হতে পারে তা কেবল শকুন্তলার চরিত্রের মধ্যেই পাওয়া সম্ভব।

আবার 'বিক্রমোর্বশীয়ম্' নাটকের নায়িকা উর্বশীকেও মহাকবি একটি লতার সঙ্গে অভিন্ন করে এঁকেছেন। তাই দীর্ঘবিরহে কাতর পুরূরবাও একটি লতার মধ্য দিয়েই তাঁর প্রিয়ার সান্নিধ্য উপভোগ করতে চেয়েছেন— 'যাবদস্যাং প্রিয়ানুকারিণ্যাং লতায়াং পরিষ্বঙ্গ-প্রণয়ী ভবামি।'

'মেঘদূত' কাব্যে নারীর সঙ্গে প্রকৃতির এই চিত্র আরও ব্যাপক। বলতে গেলে স্বামী বিচ্ছেদে নারীর চিরন্তন বিরহই সেখানে যক্ষপত্নীর রূপকে সারা বিশ্বঅরণ্যের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে। বিরাটের মধ্য দিয়েই তা বিস্তৃতি-লাভ করেছে। যক্ষপতির সঙ্গে প্রিয়ার মিলনে তাই মেঘই নিযুক্ত হয়েছে।

কিন্তু গৃহবধূরূপে নারীর কোন পরিচয় কালিদাসেব সাহিত্যে অনুপস্থিত সেকথা সত্য। তথাপি গৃহবধূরূপে নারীর চরিত্রকে গড়ে তোলার একটি পরিকল্পনা যে কালিদাসের মাথায় ছিল তার একটি প্রমাণ পাই শকুন্তলমে। মহামুনি কণ্ব সেখানে পতিগৃহ যাত্রার প্রাক্কালে শকুন্তলাকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন--"গুরুজনের সেবা করবে, সপত্নীদের সঙ্গে বধূর মতো ব্যবহার করবে, স্বামীর দ্বারা তিরস্কৃতা হলেও কখনও তাঁর বিরুদ্ধাচারিণী হবে না, পরিজনের প্রতি উদারস্বভাবা হবে এবং ভুলেও কখনো নিজের ভাগ্য নিয়ে গর্ব করবে না। কারণ এইসব গুণের দ্বারাই রমণীরা আদর্শ গৃহিণীপদ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। আর যাঁরা এর বিরুদ্ধাচরণ করেন তাঁরা বংশের পীড়াস্বরূপ।"

কুমারসম্ভবেও দেখি পুরোহিত সেখানে উমাকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, তিনি যেন স্বামীর সঙ্গেই তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হন, ভুলেও যেন এর অন্যথা তিনি না করেন। কারণ স্বামীর সঙ্গে নির্বিচারে ধর্মপালন করাই নারীর কর্তব্য। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় একটি বিষয়ে। তবে কি নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা কালিদাস এক্ষেত্রে চিন্তাই করেননি? যদি করেন তাহলে নারীর এমনতর রূপ কেন?

আরও একটি কথা। কালিদাসের নায়িকারা কোন না কোনভাবে বিরহ-যন্ত্রণার শিকার। এর মূলে কাজ করেছে কখনও তাদের, আবার কখনো বা

নায়কদের কর্তব্যে কর্মে অবহেলাজনিত কোন অপরাধ। আর তার ফলেই নেমে এসেছে বিরহ। আসলে কালিদাস বিশ্বাস করতেন, যে সহজে পাওয়া জিনিস সহজেই হারিয়ে যায়। তাই প্রেমকে পরীক্ষিত করার কারণেই প্রয়োজন হয় বিরহ তপস্যার।

শকুন্তলমে এই বিরহ এসেছে নায়িকা শকুন্তলারই কর্তব্যচ্যুতির অপরাধে। তাঁর অপরাধ এই যে তিনি একমনে দুষ্মন্তের চিন্তা করায় আশ্রমে উপস্থিত দুর্বাসাকোপ মহর্ষির আগমন বিন্দুমাত্রও টের পাননি। ফলতঃ তাঁকে আপ্যায়িত করাও সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। অর্থাৎ যেখানে তাঁর উচিত ছিল আশ্রমদ্বারে উপস্থিত অতিথিকে সাদরে বরণ করা, তাঁর পাদ্য অর্ঘ্যের ব্যবস্থা করা—সেখানে তিনি তা না করে চরম ঔদাসীন্যেরই পরিচয় দিয়ে বসলেন। ফলে তাঁকে হতে হল চরমভাবে অভিশপ্ত। সমালোচকও লিখেছেন, প্রেম অতি উৎকৃষ্ট বস্তু কিন্তু সেই প্রেম যখন সমাজ সংসার ভুলিয়ে দেয় তখন তা অতিশয় অপকৃষ্ট হয়ে পড়ে। শকুন্তলা এই নৈতিক নিয়ম ভঙ্গ করেছিলেন বলেই এত কষ্ট ভোগ করলেন। এখানে তাঁর কর্তব্যচ্যুতির দিকটিই বিশেষভাবে প্রকট।

তথাপি শকুন্তলার প্রতি কালিদাসের এই অভিশাপ ছিল এক অর্থে আশীর্বাদই। কারণ প্রেম এতে দ্বিখণ্ডিত হল বটে কিন্তু তা প্রকারান্তরে মঙ্গলকেই আনয়ন করল। শকুন্তলাকেও দেখা গেল, বিরহব্রতচারিণীর বেশে একবেণীধরা হয়ে তিনি কালাতিপাতে ব্রতী। এখানে যেন তিনি সাধিকার স্তরে উত্তীর্ণা। স্বামীর বিরুদ্ধেও তাঁর কোন অভিযোগ নেই। তাই ত মারীচের আশ্রমের এক অপার্থিব ভাবলোকে তাঁদের মিলন সম্ভব হতে পারল। "Earthly Love" রূপান্তরিত হল "Heavenly Love"-এ। তাই দুষ্মন্তের চোখেও তিনি আর "রতি সর্বস্বম্ অধরম্" নন, তিনি হলেন "পরিধূসরে বসনা ধৃতৈকবেণী।" তাঁর পরিণতি সত্যসত্যই ফুল থেকে ফলে পরিণতি, স্বর্গ থেকে মর্ত্তে পরিণতি, স্বভাব থেকে ধর্মে পরিণতি।

পরিশেষে শকুন্তলার চরিত্রাঙ্কনের পালা সাঙ্গ করার পূর্বে আমরা আর একবার ফিরে যাই রবীন্দ্রনাথেরই কাছে। কারণ তাঁর মতামতকেই আমাদের চূড়ান্ত বলে মনে হয়। কবি যথার্থই বলেছেন, শকুন্তলা যেমন তরুলতা পুষ্পের ন্যায় আত্মবিস্মৃতা, স্বভাবধর্মে অনুগতা তেমনি অন্যদিকে তাঁর নারী প্রকৃতি সংযত, সহিষ্ণু, একাগ্র তপঃপরায়ণা ও কল্যাণধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিতা। তাঁর পিতা ঋষি, তাঁর মাতা অপ্সরা। ব্রতভঙ্গে তাঁর জন্ম। তপোবনে তাঁর পালন। বুঝিবা সেকারণেই তিনি অরণ্যের সরলা মৃগীর মত (নির্ঝরের জলধারার মত) মলিনতার সংস্রবেও যিনি অনায়াসে নির্মল।

কুমারসম্ভব কাব্যেও পার্বতীর এই বিরহিণীর রূপটি প্রকাশিত। তিনিও বুঝেছেন রূপসী হয়ে কামাবেগের তাড়নায় দেবাদিদেবকে লাভ করতে চাইলে

সে সাধনায় কখনই সিদ্ধি আসবে না। তাই প্রকৃত সুন্দরীর মূর্তিতে অনেকটা বিরহিণীর মতই তিনি দেবাদিদেবের সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করলেন। সিদ্ধও হলেন সে'সাধনায়। কারণ এই যে প্রণয় তাতে পার্বতীর চরিত্রে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতির লেশমাত্র অনুপস্থিত।

'মেঘদূত' কাব্যের নায়িকা যক্ষপত্নীও এই বিরহের শিকার। কবিকল্পনায় তিনিও বিরহিণীর মূর্তিতে স্বামী চিন্তায় ব্রতী। তারপর মেঘ এসে তাঁকে একদিন জানিয়ে দিয়ে যায় মিলন তাঁদের হবেই। সুখদুঃখ মানুষের চিরকাল সমান যায় না। ভাগ্যচক্রের আবর্তনে ক্রমাগতই তার ওঠানামা চলছে। আর এই বিরহের সময়সীমাও ত মাত্র একবছর। তাই বলা যায় কালিদাসের নারী বিরহযাতনা ভোগ করলেও, তাঁদের মিলনের পথে তা কখনও অন্তরায় হয়ে ওঠেনি বরং মিলনের পথকেই তা করে তুলেছে প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর।

এবার মহাকবি কালিদাস সৃষ্ট কয়েকটি গৌণ চরিত্রের আলোচনা করা যেতে পারে বর্তমান প্রবন্ধে। কিন্তু প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে এ'রা আপাতঅর্থে গৌণ হলেও প্রকৃত অর্থে কিন্তু মূল চরিত্রগুলির পরিস্ফুটনে সক্ষম। এমনকি নাটকীয় ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতেও তাঁদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বলাবাহুল্য এ'দের মধ্যে রাজ্ঞী চরিত্র যেমন আছে তেমনিই আছে দূতী বা সখী চরিত্র। উদাহরণস্বরূপ অভিজ্ঞান শকুন্তলমের দুই সখী অনসূয়া, প্রিয়ংবদার কথাই প্রথমে ধরা যাক।

অনসূয়া-প্রিয়ংবদা হলেন শকুন্তলার একেবারে প্রাণের বন্ধু, হরিহর আত্মা। শকুন্তলার প্রেমের পথে তাঁরা হলেন দুই প্রধানা সহায়িকা চরিত্র। শকুন্তলার নিরাপত্তা বিষয়েও এ'রা সদা সচেতন। নাটক অভিজ্ঞান শকুন্তলমের একেবারে প্রথমাঙ্কেই তাঁদের আবির্ভাব। তাঁদের কাছে শকুন্তলা হলেন নবমল্লিকার মতই কোমল। তাত কণ্বের তাই কখনই উচিত হয়নি, ফুলের মত কোমল তাঁর দেহলতাকে আলবাল পূরণে নিযুক্ত করা। অনসূয়াই বলেছে, "যেন নবমল্লিকা-কুসুম-পেলবাপি ত্বম্ এতেষাম্ আল বাল পূরণে নিযুক্তা"। এ থেকে সখীর প্রতি তাঁদের আন্তরিকতাই প্রকাশিত হয়েছে।

তবু পার্থক্যও তাঁদের মধ্যে বিস্তর। প্রিয়ংবদা হলেন চটুল ও বাক্‌পটু। অনসূয়া প্রশান্ত ও সংযত। আবার প্রিয়ংবদা যেখানে উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্না সেখানে অনসূয়া হলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্না। তাই দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার প্রেম চলাকালীন প্রিয়ংবদা যেখানে জিজ্ঞাসা করেছেন তাঁদের সখীকে তিনি গ্রহণ করবেন কিনা, সেখানে অনসূয়াকে দেখা গেছে রাজান্তঃপুরে তাঁর সখীর স্থান কোথায় সেবিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে। কিংবা শকুন্তলার উদ্দেশে ঋষি দুর্বাসার অভিশাপ শুনে প্রিয়ংবদার যেখানে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা সেখানে অনসূয়া মোটেই ততটা বিচলিত নন। বরং মানসিক বিচলতাকে গোপন করে তিনি

একথাই বলেছেন, "প্রিয়ংবদা অনুনয় বিনয় করে অতিথিকে ফেরাও, আমি অর্ঘ্যবারির ব্যবস্থা করি।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে শকুন্তলার জীবনের সঙ্গে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা কোথায় যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই মন্তব্য করেছেন যে একা শকুন্তলা ত শকুন্তলার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। শকুন্তলার অধিকাংশই ত অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা। শকুন্তলাই সর্বাপেক্ষা অল্প। বারোয়ানা প্রেমালাপ ত তাঁরাই সুচারু রূপে সম্পন্ন করে দিয়েছে।

এবার 'শকুন্তলম্' নাটকের অন্য এক গৌণ চরিত্র আশ্রমমাতা গৌতমীর প্রসঙ্গ। তিনিও আশ্রম জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গ বিজড়িত। নাটকে তাঁর ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। বিদায় দৃশ্যের চিত্রে তাই শকুন্তলা পতিগৃহে যাত্রা করলে, অভিভাবকের মতই তিনি শকুন্তলাকে বলেছেন, "বৎসে আচার সম্পন্ন কর অর্থাৎ পিতা কণ্বকে তোমার প্রণাম নিবেদন কর।"

নাটকের পঞ্চমাঙ্কেও তাঁর আবির্ভাব হয়েছে। শকুন্তলা গ্রহণে অসম্মত দুষ্মন্তকে উদ্দেশ করে তাঁকে বলতে শোনা গেছে, "নাপেক্ষিতো গুরুজনঃ অনয়া, ন ত্বয়াপি পৃষ্টবন্ধুঃ। /একৈকস্য চ চরিতে ভবনুকিমেক একস্মিন্" অর্থাৎ আত্মদান করার সময়ে তাঁরা কেউই যখন গুরুজন কিংবা বন্ধুবান্ধবের মতামত গ্রহণ করেননি, তখন শকুন্তলাকে গ্রহণ করার ব্যাপারেও বা গৌতমীদের কি বলার থাকতে পারে? উক্তিটি থেকে আশ্রম মাতা গৌতমীর যুক্তিমত্তাবোধই প্রকাশিত হয়েছে লক্ষ্য করা যায়।

আবার ঘটনাপরম্পরায় যখন সত্যসত্যই শকুন্তলাকে পরস্ত্রীজ্ঞানে বিবেচনা করে তাঁকে গ্রহণ করতে অসম্মত হলেন রাজা দুষ্যন্ত, এমনকি শকুন্তলাকে কপট বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করলেন তখন এই গৌতমীকেই আমরা পেয়েছি ব্যক্তিত্বশালিনীর ভূমিকায়। অর্থাৎ রাজা দুষ্মন্তের একথাকে একবাক্যে মেনে না নিয়ে বরং দৃঢ়ব্যক্তিত্বময়ী তিনি একথাই জানিয়েছেন, "মহারাজ এরূপ কথা বলা আপনার সম্পূর্ণ অনুচিত। কারণ এ তপোবন লালিতা। এতএব কপটতায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা।

'বিক্রমোর্বশীয়ম্' নাটকের গৌণ চরিত্র হিসেবে পাটরাণীর কথাও বলতে হয়। পাটরাণী রাজপরিবারের প্রবীণা গৃহিনী। স্বামীর প্রতি ভালবাসা তাঁর সীমাহীন। তিনি সতীসাধ্বী রমণী। তাঁকে প্রথম দেখি নাটকের তৃতীয়াঙ্কে। দেখি কাশীরাজ কন্যা সেই পাটরাণী তাঁর 'প্রিয়ানুপ্রসাদন' ব্রত উদ্‌যাপন করতে উপস্থিত হয়েছেন মহারাজের কাছে। রাজা পুরুরবাও অবশ্য তাঁর পরিধানের শ্বেতবসন, অঙ্গে মঙ্গলানুষ্ঠানের অলংকার, কেশগুচ্ছে পবিত্র দূর্বাদল প্রভৃতি দেখে আগেই অনুমান করে নিয়েছেন, যেন ব্রতের ছলেই তিনি মহারাজের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে এসেছেন।

তবু পাটরাণীকে কেবল ব্রতিনী বলেই আমরা নাটকে পাই না, সেইসঙ্গে তাঁর চরিত্রের উদারতার প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। যেমন ব্রতশেষে প্রণামপূর্বক রাজাকে তাঁর উক্তি, "আকাশবিহারী রোহিনী ও চাঁদকে সাক্ষী রেখে আর্যপুত্রের প্রসন্নতার উদ্দেশে শপথ নিচ্ছি, তিনি যে রমণীকেই কামনা করবেন অথবা যে রমণীই তাঁকে কামনা করুন, তার সঙ্গে নির্বিরোধেই আমি কালাতিপাত করব।' কিন্তু আর একটি প্রশ্ন এখানে দেখা দেয়। তবে কি স্বামীর প্রতি তার ভালবাসায় কোনরকম খাদ ছিল? কারণ নারী যতই না কেন সর্বংসহা হন, একটি ব্যাপারে ত তাঁরা চরম স্বার্থপর। পতিপ্রেমের অংশীদার ত তাঁরা কাউকেই করতে চান না। তাহলে, তাহলে কি পাটরাণীকে আমরা একটু অন্য ভাবে ভাবব?

নায়িকা উর্বশীর সঙ্গেও পাটরাণীর পার্থক্য অনেক। উর্বশী হলেন ভোগের নিত্য লীলাভূমি। অনেকটা 'মেঘদূত' কাব্যের নায়িকা যক্ষপত্নীর মতো। কিন্তু অপরপক্ষে পাটরাণী হলেন তপস্যার মূর্তবিগ্রহ। তাঁর গতি-বিধিও সর্বত্র। সমালোচক তাই যথার্থই বলেছেন, প্রবৃত্তির পরিণাম বন্ধন। তাই স্বর্গবিহারিণী মুক্তপক্ষিনী উর্বশীকে সংসারে এসে সংকীর্ণ প্রতিষ্ঠান নগরে আবদ্ধ থাকতে হল আর ত্যাগের পরিণাম মুক্তি, তাই সংসারের পঙ্কিল আবর্তে বদ্ধ থেকেও মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় বিচরণ করতে লাগলেন পাটরাণী।

প্রসঙ্গতঃ 'বিক্রমোর্বশীয়ম্' নাটকের অপর এক গৌণচরিত্র চিত্রলেখার কথাও আমাদের স্মরণ করতে হয় এপ্রসঙ্গে। চিত্রলেখা উর্বশীর সখী। নাটকের প্রথমাঙ্কেই রম্ভার উক্তি থেকে তাঁর পরোক্ষে আবির্ভাব ঘটেছে নাটকে, "প্রত্যা-বর্তনকারিণী উর্বশীকে হরণ করে নিয়ে গেছে হিরণ্যপুরবাসী কেশী দৈত্য, সঙ্গে ছিলেন চিত্রলেখাও।"

চিত্রলেখা অনসূয়া-প্রিয়ংবদার মত উর্বশীর জীবনের এক-তৃতীয়াংশ রূপে পরিগণিত না হন, উর্বশী-পুরূরবার প্রেম নিবেদনের পথে তাঁরও রয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। উর্বশীর মানসিক বৈকল্যের সন্ধান দিতে গিয়েই তিনি মহারাজকে জানিয়েছেন, "কেশিদানকৃত বিপদের সময়ে উর্বশী যখন প্রথম মহারাজের দর্শন পেয়েছিল, তখন থেকেই দানবরূপী মদন তাকে পীড়িত করে চলেছে। সুতরাং আগের বারের ন্যায় এবারেও সে মহারাজের দয়াপ্রার্থী।" বলাবাহুল্য এভাবেই উভয়ের প্রেম নিবেদনের পথে সংযোজকের ভূমিকা নিয়েছেন চিত্রলেখা।

হাস্যরসিকতাতেও চিত্রলেখা অনন্যা। একবার উর্বশী নিজেকে অভিসারিকা বেশে সজ্জিত করে তাঁর এই প্রিয়সখীর কাছে মতামত চাইতে গেলে তিনি শ্লেষ ভণিতা করেই জানিয়েছেন, "সঠিক প্রশংসা করার মত ভাষা আমার নেই। শুধু ভাবছি একথাই, আমি যদি পুরূরবা হতাম।"

এবার গৌণ রাজ্ঞী চরিত্র হিসেবে 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকের রাণী ইরাবতীর প্রসঙ্গ। রাজার প্রতি তাঁর দৃষ্টি খুবই প্রখর। এমনকি মালবিকার প্রতি রাজার দুর্বলতার খবরও তাঁর অজ্ঞাত নয়। রাজা অগ্নিমিত্রও তাঁকে যথেষ্ট বুঝে চলেন। একদিন তাই মালবিকার প্রতি তাঁর প্রেমার্তিকে গোপন করতে তিনি ইরাবতীকে বলেছেন, "দেখ, মালবিকার প্রতি আমার কোন আগ্রহই নেই। শুধু তোমার আসতে দেরী হচ্ছিল দেখে একটু সময় কাটাচ্ছিলাম।"

রাণী ধারিণীর প্রতিও শ্রদ্ধা আছে ইরাবতীর। ধারিণীকে তিনি একজন ক্ষমতাশালিনী বলেই মনে করেন। শেষ অবধি তাই মালবিকার সঙ্গে রাজা অগ্নিমিত্রের বিবাহের সব ব্যবস্থা পাকা করে ধারিণী তাঁর মতামত জানতে চাইলে তিনি স্পষ্টই জবাব দিয়েছেন, তাঁর মত ক্ষমতাশালিনীর পক্ষে প্রতিশ্রুতির অন্যথা করা উচিত হবে না। অতএব তিনি যেন তাঁর মনের মতই কার্য করেন।

ইরাবতীর সঙ্গে ধারিণীর পার্থক্য অনেক। রাজপরিবারে ধারিণীর যে পদমর্যাদা ইরাবতীর তার বিন্দুমাত্রও নেই। আবার উদারতার দিক থেকেও ধারিণীর ধারে কাছে নেই ইরাবতী। বিশেষতঃ সতীন মালবিকাকে যেভাবে তিনি গ্রহণ করেছেন তাতেই প্রমাণিত হয়েছে তাঁর চিত্তের প্রসারতা, অবশ্য যদি একে সত্যসত্যই প্রসারতা বলা যায়, তথাপি স্বামীর প্রতি তাঁর নজর যে ছিল অবিচল সেকথা খুবই সত্য। বলতে গেলে ইরাবতী যেখানে কেবল নিজেকে নিয়েই শুধু ব্যস্ত সেখানে ধারিণীকে আমরা পেয়েছি "মহীয়সী" রূপে। তিনি যথার্থই সতীসাধ্বী রমণী। যাঁরা স্বামীসত্তায় নিজেদের বিলীন করে দেওয়ার মধ্যেই দেখেন নারী জীবনের চরম সাথকতা, ধারিণী তাঁদেরই একজন। স্বয়ং পরিব্রাজিকাও আমাদের জানিয়েছেন, সতীন মালবিকাকে গ্রহণ করাটা তাঁর পক্ষে এমন কিছুই আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। কারণ শত্রুর দ্বারাও পতিবৎসলা রমণীরা তাঁদের পতির সেবা করে যান, সাগরাভিমুখে ধাবিত নদী যেমন অন্য নদীর জলকেও বয়ে নিয়ে যায় ঠিক তেমনি। যদি তাই হয় তাহলে কি আমরা ধারিণীকে সর্বংসহা ধরিত্রীর প্রতীক বলেই ভাবব, যিনি স্বামী-প্রেমের অংশীদার রূপে সতীনকে মেনে নিতেও কোনরূপ কুণ্ঠিত হন না?

পরিশেষে আরও একটি কথা জানাই। কালিদাসের নারী চরিত্রগুলি একান্তভাবেই মানবী। তাই ভবভূতির সীতার সমগোত্রীয়া তাঁরা কখনই হতে পারেন না। দোষ গুণের মিলিত আধার রূপেই তাঁদের আত্মপ্রকাশ। তাঁরা একদিকে কামসম্ভবা ঠিকই কিন্তু অন্যদিকে ভারতীয় পাতিব্রত্যের ঐতিহ্যেও সুপ্রতিষ্ঠিতা। বিরহই তাঁদের জীবনের তপস্যা। বিরহের মাধ্যমেই কালিদাস তাঁদের প্রেমকে পবিত্রস্তরে উত্তীর্ণ করেছেন। তাঁরা রূপবতী ঠিকই কিন্তু মৌখিকভাবে সে রূপের অহংকার তাঁরা করেন না। নায়কের সঙ্গ লাভই তাঁদের একমাত্র অভিপ্রেত। আবার অন্যদিকে অপ্রধানা নারী চরিত্রগুলিও আপন আপন সীমায় উজ্জ্বল। নাটকের রসপরিণতিতে বা নাটকীয় বলয় নির্মাণে তাঁদের ভূমিকাও নেহাৎ কম নয়।

বাংলার ব্রতগুলির নাটকীয় উপাদান

বাংলার বিভিন্ন ব্রতগুলির উৎপত্তির মূলে ধর্মীয় প্রেরণা অথবা শিল্প প্রেরণা যাই থাকুক না কেন, পুরাকালের সেইসব আদিম ধর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নাট্যশিল্পের অংকুরটি যে যথার্থভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেননা কাহিনী নির্মাণ থেকে শুরু করে, কথোপকথন, পরিবেশ সৃষ্টি, সঙ্গীতের সংযোজন, একাধিক পাত্রপাত্রীর উপস্থিতি, নাটকীয় দ্বন্দ্বের অবতারণা প্রভৃতির মাধ্যমে ব্রতের ছড়াগুলি এমনভাবেই নানা দৃশ্য ও অঙ্কভেদে সাজানো রয়েছে, যা থেকে নাটকীয় উপাদানের বিক্ষিপ্ত উপস্থিতি সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাই নাট্যের আদলে কোথাও দেখব সেগুলি পাত্রপাত্রী এবং নানা দৃশ্য ও অংকভেদে সাজানো। যদিও খুব ছোট কিন্তু এই সব ছড়াকে অভিনয় করার উদ্দেশেই যে গাঁথা হয়েছিল সেটা বেশ বোঝা যায়। তাই ব্রতগুলিকে সম্পূর্ণ আকারে যখন দেখবো তখন পরিষ্কার বোঝা যাবে সেটা নাটক কি ছড়া। অবনীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য যথার্থ।

উদাহরণস্বরূপ আমরা 'ভাদুলী' ব্রতটির কথা বলতে পারি। বলা চলে এটি পুরোপুরিই নাটকের আদলে তৈরী। এর মধ্য দিয়ে একটি চমৎকার নাটকীয় কাহিনী পরিস্ফুট। কাহিনীটি এইরকম—বাপ, ভাই, শ্বশুর সকলে মিলে গেছে বিদেশে বাণিজ্য করতে। কিন্তু পথে কতই না বিপদ, কতই না প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা। তাই বাণিজ্য যাত্রা শেষে তাঁরা যেন প্রচুর ধনদৌলত নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন, নদীকে সেই কামনা জানিয়েই এই ব্রত। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বহুখ্যাত "বাংলার ব্রত" গ্রন্থে চমৎকারভাবে ব্রতটির আলপনাকে দৃশ্যপট হিসেবে ব্যবহার করে ছড়া ও মেয়েলী আচার থেকে এর নাটকীয় গঠনশৈলীটি আবিষ্কার করেছেন। শৈলীটি এই রকম—

প্রথম দৃশ্য

ক্রিয়া আরম্ভ হল। ভাদ্র মাসের ভরা নদী। কলসী কাঁখে জল তুলতে চলেছে একটি ছোট মেয়ে এবং তার চেয়ে একটুও বড় নয় এমন একটি ঘোমটা দেওয়া বৌ এবং তার সঙ্গীগণ।

(জল তোলার গান বা ছড়া)

এ নদী সে-নদী একখানে মুখ,
ভাদুলী ঠাকুরাণী ঘুচাবেন দুখ।
এ নদী সে-নদী একখানে মুখ
দিবিনে ভাদুলী তিনকুলে সুখ ॥

একে একে নদীর জলে ফুল দিয়ে—

(ছোট মেয়ে)

নদী-নদী কোথায় যাও ?
বাপ্-ভায়ের বার্তা দাও ।

(ছোট বৌ)

নদী, নদী কোথায় যাও
সোয়ামী শ্বশুরের বার্তা দাও ।

ইতিমধ্যে এক পসলা বৃষ্টি এল । সকলে জলে স্থলে ফুল ছিটিয়ে—

নদীর জল, বৃষ্টির জল যে জল হও,
আমার বাপ্ ভায়ের সম্মাদ্ দাও ।

বৃষ্টির শেষে মেঘে কালো আকাশ দিয়ে এক ঝাঁক সাদা বক উড়তে উড়তে চলে গেল । একদল কাক কা কা করতে করতে বড় একটা বকুল গাছ ছেড়ে গ্রামের দিকে উড়ে পালালো । আকাশ এমন সময়ে একটু পরিষ্কার হচ্ছে—

(মেয়ে)

কাগারে ! বগারে । কার কপালে খাও ?
আমার বাপ্-ভাই গেছেন বাণিজ্যে কোথায় দেখ্‌লে নাও ?

মেঘফাটা রৌদ্রে ভরা বুকে বালুচরের একটু মরীচিকা ঝিক্‌মিক্ করেই মিলিয়ে গেল—

(মেয়ে)

চড়া ! চড়া ! চেয়ে থেকো
আমার বাপ্-ভাইকে দেখে হেসো ।

কোন গ্রামের একটা দড়ি ছেঁড়া ভেলা স্রোতের টানে হু হু করে বেরিয়ে গেল ।

(মেয়ে)

ভেলা ! ভেলা ! সমুদ্রে থেকো,
আমার বাপ্-ভাইকে মনে রেখো ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ব্রত ক্রিয়ার দ্বিতীয় দৃশ্য আরম্ভ হল । বনজঙ্গলে ঘেরা পর্বত, অন্ধকার রাত্রি, দূরে নানা জন্তু ও সমুদ্রের নানা গর্জন শোনা যাচ্ছে ।

(মেয়ে সভয়ে)

বনের বাঘ ! বনের মোষ !
তোমরা নিও না আমার বাপ্-ভায়ের দোষ ।

(সকলে কাঁদতে কাঁদতে)

বাপ্-ভাই গেছেন কোন ব্রজে ?
সোয়ামী, শ্বশুর গেছেন কোন ব্রজে ?

(বনদেবী আশ্বাস দিয়)

তারা গেছেন এক পথে,
ফিরে আসবেন আর পথে।

উদয়—গিরিশিখরে সূর্যোদয়ের আভা জাগল। উদয় গিরিকে ফুল দিয়ে পুজো করে—

(সকলে)

কাঁটার পর্ব্বত ! সোনার চূড়া ! উদয় গিরি !
তোমারে যে পূজলাম সুমঙ্গলে, আসুন তাঁরা আপন বাড়ি।

(বনদেবীর প্রতি সকলে)

তোমার হোক সোনার পিঁড়ি।

সূর্যোদয়ের আলোর মধ্যে জোড়া ছত্র মাথায় দিনরাত্রি শরৎ-বর্ষার দুই নৌকায় পা রেখে সমুদ্রের ওপরে ভাদুলীর আবির্ভাব।

(সাগরের গান)

সাত সমুদ্র বাতাস মেলে, কোন সমুদ্রে ঢেউ তুলে !

(বনদেবী সাগরের প্রতি)

সাগর ! সাগর ! বন্দি।

(মেয়ে)

তোমার সঙ্গে সন্ধি।

(সাগরকে ঘিরে সকলে)

ভাই গেছেন বাণিজ্যে
বাপ্ গেছেন বাণিজ্যে
সোয়ামী গেছেন বাণিজ্যে।

(আকাশবাণী)

ফিরে আসবেন আজ
ফিরে আসবেন আজ।
ফিরে আসবেন আজ।

(সকলে মিলয়া নমস্কার)

জোড়-জোড়-জোড় সোনার ছত্তর জোড় নৌকায় পা।
আসতে আসতে কুশল করবেন ভাদুলী মা।

তৃতীয় দৃশ্য

গ্রামের মধ্যে ভাদুলী অনুষ্ঠানের তৃতীয় দৃশ্য বা পালা শুরু হল। ভাদ্রের শেষ দিন। নতুন নতুন শরতের সকাল ঘুমন্ত গ্রামখানির উপরে এসে পড়েছে। মেয়েদের খিড়কির পুকুর কানায় কানায় পরিপূর্ণ। তার ওপরে সোনার রোদ ঝিক্ মিক্ করছে। পুকুরের পাড়ে জোড়া তালগাছ। তাতে বাবুই পাখির বাসা—

(বাবুই পাখি খাচ্ছে)

পুঁটি! পুঁটি! উঠে চা।

ভাদুলী মায়ে বর দিল—

ঘাটে এল সপ্ত না।

কুটিরের ঝাঁপ খুলে, নৌকা বরণের থালা হাতে সব মেয়ে বৌয়ে একে একে বাইরে আসছে—

(বুড়ী পড়্শী)

পড়্শী লো পড়্শী
তাল তাল পরমায়ু, তালের আগে চোক্!
ঘাটে এসে ডঙ্কা দেয়, কোন বাড়ীর নোক্?

(মেয়েরা বৌরা)

আমার বাড়ির নোক্, আমার বাড়ির নোক্!

দূরে ডঙ্কা পড়লে একদল বাবুই কিচ্মিচ্ করে বাসা ছেড়ে উড়ে গেল।

(মেয়েরা সকলে)

বাবুই বাসা দল দল!
নৌকা ধরতে ঘাটে চল্, ঘাটে চল্!

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

সকাল বেলায় নদী তীরে ভাদুলীর পালা সাঙ্গ হচ্ছে। গঙ্গার অনেক দূরে দূরে ঘরমুখো সব নৌকা। সাদা সাদা পালগুলি দেখা দিয়েছে। কতকগুলো নৌকা পরের পর এসে ঘাটে লাগল। যাত্রী ওঠা নামার পর নৌকা ভেড়াবার কৌতূহল। প্রবাসীরা সব পোঁটলা-পুঁটলী নিয়ে ডাঙায় নামছে।

(মেয়েরা নৌকা বরণ করে)

এগুলোয়ে ওগুলোয়ে চন্দন দিলাম বাপ্ ভায়ের দর্শন পেলাম।

(বৌরা জলে কলাবৌ ও ফুল প্রভৃতি ভাসিয়ে)

কলার কাঁদি ! কলার কাঁদি !
তোমাকে দিলাম গঙ্গায়, আমরা গিয়া রাঁদি

(যাত্রী ও নাবিক দলের গান)

একুল ওকুল উজান ভাটি
নামলাম এসে আপন মাটি
এক নৌকা চড়ায় লাগালাম
এক নৌকা ছাড়লাম
ব্রজে যাই, বাণিজ্যে যাই,
সকল নৌকা পেলাম ।

(সুতো ধরে সকলকে ঘিরে মেয়েরা)

দিক্ দিক্ সকল দিক্ সকল দিকেই বামুন ।
ব্রজে হোক বাণিজ্যে হোক দেবতায় বেঁধে রাখুন ॥

(গায়ে নামাবলী, কোশাকুশি হাতে গ্রামের আচার্য্যির প্রবেশ)

(আচার্য্যি)

নম নম ভাদুলী দেবী ইন্দ্রের শাশুড়ি ।
বছর বছর রক্ষা করো ব্রতের পুরী ।

[যবনিকা পতন]

এবার নাটকের অন্যতম উপাদান হিসেবে ব্রতের ছড়ায় কথোপকথনের প্রসঙ্গটি আলোচনা করা যেতে পারে। কারণ নাটকের কাহিনীবলয় যেমন বিভিন্ন চরিত্রের দ্বারা উক্ত কথোপকথনের মাধ্যমেই ক্রমশঃ এগোতে শুরু করে তেমনি আমাদের কোন কোন ব্রতের ক্ষেত্রেও দেখব তারা কিভাবে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে এগিয়ে গেছে শুধুমাত্র কথোপকথনকে আশ্রয় করেই। অবশ্য এবিষয়ে আমরা পূর্বে আলোচিত 'ভাদুলী' ব্রতটির গঠনশৈলী থেকেই কিছুটা অনুমান করতে পারি। কেননা অবনীন্দ্রনাথ সেই ব্রতের কাহিনীটিকেও মূলতঃ দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে এগিয়ে নিয়ে গেছেন ছোট মেয়ে, বৌ, পুরোহিত, বুড়ী পড়শী, যাত্রি, নাবিক কিংবা আচার্যের পারস্পরিক কথোপকথনকে আশ্রয় করেই। অবশ্য এই উপাদান বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে একাধিক ব্রতেই। বলা চলে নাট্যকার যেমন নিজে কাহিনীতে অনুপস্থিত থেকে তাঁর অভিপ্রেত বক্তব্যগুলি পাত্র-পাত্রীদের পারস্পরিক সংলাপের মাধ্যমেই বলিয়ে নেন, সেইসব কৌশল এইসব ছড়াগুলিতেও বিদ্যমান রয়েছে দেখতে পাই। যেমন 'হরির চরণ' ব্রতে এইরূপ কিছু কথোপকথনের নমুনা—

হরি বলেন-ওগো মা
আজ কেন গো শীতল পা

কোন যুবতী পুজে পা
সে যুবতী কি চায় ?

ভগবান হরির এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলা হল—

রাজ্যেশ্বর স্বামী চায়,
দরবার জোড়া ব্যাটা চায়
সভা উজ্জ্বল জামাই চায়
প্রেমানন্দ ভাই চায়—ইত্যাদি।

আবার 'অশ্বত্থ পাতা' ব্রতেও হরগৌরীর এইরূপ কিছু কথোপকথনের নমুনা—

হর বলেন গৌরীকে
এ ব্রত করলে কি হয় ?

ভগবতী বললেন—

পাকা পাতাটি মাথায় দিলে
পাকা চুলে সিঁদুর পরে।
কাঁচা পাতাটি মাথায় দিলে,
কাঞ্চন মূর্তি হয়
কচি পাতাটি মাথায় দিলে
নবকুমার কোলে হয়—ইত্যাদি।

এইরকম নমুনা আরো আছে। তবে তার দৃষ্টান্ত বৃদ্ধি না করে পরবর্তী প্রসঙ্গে যাওয়া যাক বর্তমান প্রবন্ধে।

সত্যকথা বলতে কি নাটকের মধ্য দিয়ে আমরা যেমন একটি অখণ্ড কাহিনীর সন্ধান লাভ করি, সেইরূপ সন্ধান লাভ আমাদের কোন কোন ব্রতের মাধ্যমেও করা সম্ভব।' আনুপূর্বিকতাই যেগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন 'মাঘমণ্ডল' ব্রতটির কথাই ধরা যাক।

ব্রতটির প্রারম্ভিক দৃশ্য এই, শীতের শেষরাত্রে গ্রামের ব্রতীনীরা সব একজোটে যেন কোন পুকুরের পাড়ে তাদের ব্রত করার আয়োজন করছেন, আর তারপরই তাঁদের পারস্পারিক কথোপকথনের দ্বারা নাটকীয় কাহিনীর সূত্রপাত—

১ম জন—চোখে মুখে জল দিতে কি কি ফুল লাগে ?
২য় জন—ইতল, বেতল, সরুয়া দুটি ফুল লাগে।

এরপরও আরোও কিছু কথাবার্তা সেরে সকলে বসেন দিবাকর সূর্যের আরাধনায়। এদিকে সমাজের নানা বৃত্তিভোগী মানুষও তাঁদের কর্মপ্রবাহে আবদ্ধ হন। যে যার কাজে চলে যান। আর তারপরই আসে চন্দ্রকলা ও সূর্যদেবের অপূর্ব প্রেমচিত্রের প্রসঙ্গটি। তাঁরা পরস্পরের রূপমাধুরীতে

হয়ে পড়েন আসক্ত। অবশেষে বিবাহও হয়। বিবাহে বেশ ভাল যৌতুকও পান স্বয়ং সূর্যদেব।

অতঃপর বিবাহান্তে পিতৃগৃহ থেকে চন্দ্রকলার বিদায় নেবার পালা। স্বভাবতঃই বাঙালী কন্যার মতই তাঁর করুণ অবস্থা। যে পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগিনীদের সঙ্গে তাঁর এতকালের সম্পর্ক ছিল অবিচ্ছেদ্য, আজ তাঁদের সকলকেই বিদায় জানিয়ে তাঁকে যাত্রা করতে হবে স্বামী গৃহের উদ্দেশে।

এরপর অবশ্য দেখি চন্দ্রকলার শ্বশুর বাড়ীতে আসার পর সেই শ্বশুর বাড়ীর চিত্র ও তারপর পাই চন্দ্রকলা ও সূর্যের মিলনের ফলে তাঁদের পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রসঙ্গটি। তাঁদের পুত্রের নাম লাউল।

অতঃপর লাউলের পালাও বর্ণিত হল, তাঁর বিবাহের কথাও প্রদত্ত হল, এমনকি লাউলের পুত্রকে গান গেয়ে ঘুম পাড়ানোর কথাও ছড়ায় উল্লিখিত হল এবং তারপর নানা ঘটনা পরম্পরায় শীতের কুয়াশা কেটে গিয়ে ভাবী বসন্তের আনন্দময় দিনগুলিকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে ব্রতও শেষ হলো।

এইরূপ নাটকীয় কাহিনীর সন্ধান লাভ একাধিক ছড়াতেই বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ আরো একটি মেয়েলী ব্রতের ছড়ার এখানে উল্লেখ করা হল। ব্রতটির নাম 'অশ্বত্থপাতা ব্রত।' এর সময়কাল বৈশাখ মাস। ছড়ায় দেখা যায় শ্যামা পণ্ডিতের ঝি চলেছেন সকাল বেলায় গঙ্গাস্নান করতে। তিনি অপূর্ব রূপবতী। সম্পদের প্রাচুর্যও তাঁর নেহাৎ কম নয়। তাই রত্ন-সিংহাসনে বসে রাজরানীর মতই তিনি চলেছেন গঙ্গাস্নানে—সঙ্গে রয়েছেন তাঁর কর্তা, সাতটি ছেলে ও তাদের বোয়েরা। তাঁরা কেউবা আসছেন শ্বেত হস্তিতে আবার কেউবা দোলাতে আবার কেউবা ঘোড়ার পিঠে।

এদিকে দেখা যায় এক অন্য চিত্র। স্বর্গ থেকে কৌতূহলী মহাদেব ভগবতীকে জিজ্ঞাসা করছেন এরা কারা, আর কি উদ্দেশেই বা তাঁদের এই ব্রত? উত্তরে গৌরী জানালেন, এর নাম অশ্বত্থপাতা ব্রত। এর উপকরণ মূলতঃ পাঁচটি পাতা, প্রতিটি পাতারই রয়েছে এক আশ্চর্য যাদুগুণ। এর কচি পাতাটি মাথায় দিলে যেমন সুসন্তানের জননী হওয়া যায় তেমনি শুকনো, ঝুরঝুরে, পাকা পাতাটি মাথায় দিলেও বিভিন্ন মনোবাসনা অচিরেই পূর্ণ হওয়া সম্ভব। আর মর্তে ব্রতীনীরা তাই করছে।

বাস্তবিকই তাঁরা তাই করছিলেন। সবশেষে এক ঘটি জল নিয়ে অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় ঢেলে তাঁরা নমস্কার করেন। ফলে চমৎকার একটি নাটকীয় কাহিনীরই সাক্ষাৎ মেলে ব্রতের ছড়াটিতে। এর পাত্রপাত্রী হিসেবে রয়েছেন শ্যামা পণ্ডিতের ঝি, তাঁর কর্তা সাত বৌ, সাত ছেলে, হরগৌরী ও সর্বোপরি সমবেত ব্রতীনীরা।

সার্থক নাটকীয় পরিবেশেরও (Dramatic situation) সন্ধান পাওয়া

যায় একাধিক ব্রতের ছড়ায়। বিশেষ করে সারারাত্রি নাচ গান, ছড়া বলা ও তারপর চাঁদের আলোয় তারার ঝিক্‌মিকের মধ্যে একটি চমৎকার নাটকীয় দৃশ্যের সাক্ষাৎ মেলে তারাব্রতে—

ষোল ষোল বাৰ্ত্তির হাতে ষোল সরা দিয়া
মোরা যাই ইন্দ্রপুরীর, নাটুয়া হইয়া ॥

'তুষ তুষলী' ব্রতটির কথাও এখানে ধরা যেতে পারে। এর সমাপ্তি দৃশ্যে দেখা যায় নদীর জলে তুষ তুষলী ভাসিয়ে দেবার পর হঠাৎ করেই যেন দেবীর আশীর্বাদে সব ফিরে আসতে লাগল ব্রতীনীদের স্বামী, শ্বশুর, বাপ-ভায়ের দল। ফলে নাটকীয় ক্লাইমেক্সেরই চূড়ান্ত লক্ষিত হয়েছে দৃশ্যটিতে কিংবা অঙ্কিত হয়েছে পাত্রপাত্রীদের এক মহামিলনের চিত্র—

তুষলী গেল ভেসে
আমার বাপ্-ভাই এলো হেসে
তুষলী গেল ভেসে
আমার শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বামী-পুত্র এলো হেসে।
তুষলী গেল ভেসে
ধনদৌলত টাকাকড়ি এলো হেসে।

আবার নাটকীয় দৃশ্যের বিচারে 'মাঘমণ্ডল' ব্রতে চন্দ্রকলার পতিগৃহে যাত্রার দৃশ্যটি আমাদের 'শকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থাঙ্ককেই স্মরণ করিয়ে দেয়। দৃশ্যটির প্রারম্ভেই দেখা যায় চন্দ্রকলা তাঁর বহু প্রত্যাশিত প্রেমিক স্বয়ং সূর্যদেবকে লাভ করলেও আজ বাপ, মা, ভাই, বোন সকলকে ত্যাগ করে তাঁকে চলে যেতে হবে পতিগৃহে। কিন্তু এদেরও যে ভোলবার নয়, তাহলে উপায়? হ্যাঁ উপায়টি বলে দিয়েছেন স্বয়ং সূর্যদেবই। তিনি বলেছেন আজ থেকে তাঁর বাপ, মা, ভাই, বোনই হবেন চন্দ্রকলার বাপ, মা, ভাই, বোনের সামিল। এখানে উভয়ের কথোপকথনে বিদায়ী দৃশ্যের কারুণ্যটি সত্যিই ঝরে পড়েছে প্রতিটি পংক্তিতে পংক্তিতে—

তোমার দেশে যার সূর্য মা বলিব কারে?
আমার মা তোমার শাশুড়ী মা বলিও তারে।
তোমার দেশে যাব সূর্য বাপ্ বলিব কারে?
আমার বাপ্ তোমার শ্বশুর বাপ্ বলিও তারে।
তোমার দেশে যাব সূর্য বইন বলিব কারে?
আমার বইন তোমার ননদ বইন বলিও তারে।
তোমার দেশে যাব সূর্য ভাই বলিব কারে?
আমার ভাই তোমার দেবর ভাই বলিও তারে।

আবার 'অশ্বত্থপাতা' ব্রতে উল্লিখিত 'পাকা পাতাটি মাথায় দিলে' ছড়াটির

নাটকীয় পরিবেশের সন্ধান করতে গিয়ে স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথই বলেছেন, এর পরিবেশটি বসন্তকালের, গাছপালায় মিলিয়ে যেন একটুখানি রূপক, যেন ছোট একটু নাটকের মত করেই তা আঁকা হয়েছে। আবার একটুখানি হলেও তাতে বসন্তের দিনে নতুন পুরোনো এবং মানুষের ও বনের এই আত্মিক সম্পর্ক যখন রূপায়িত হতে দেখা যায়, তখন এটিকে একেবারে ছোটও বলা যায় না।

নাটকে যেমন নাট্যকারের নিজস্ব বক্তব্য রূপায়িত হয় নাটকে উপস্থাপিত বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে তেমনি আমাদের ব্রত ছড়াগুলিতেও একাধিক পাত্র পাত্রীর উপস্থিতি সহজেই লক্ষণীয়। আসলে ব্রতগুলি যেহেতু অনুষ্ঠান, তাই পাত্রপাত্রীর উপস্থিতি সেখানে থাকবেই। কারণ "একজনকে দিয়ে নাচ চলে কিন্তু নাটক চলে না, তেমনি একজনকে দিয়ে উপাস্য দেবতার উপাসনা চলে কিন্তু ব্রত অনুষ্ঠান চলে না।" উদাহরণস্বরূপ আমরা 'মাঘমণ্ডল' ব্রতটির কথা বলতে পারি। মাঘমণ্ডল ব্রতটি একটি বড় আকারের নাটক এর কাহিনী যেমন দীর্ঘ তেমনি অনেকগুলি চরিত্রেরও মিলিত সমাবেশ ঘটেছে এখানে। মুখ্য চরিত্রের মধ্যে রয়েছেন স্বয়ং সূর্যদেব ও মাধব-কন্যা চন্দ্রকলা। সূর্যদেব তাঁর প্রতি প্রেমাসক্ত। কিন্তু তাঁর অপর পরিচয়ও আমাদের অজ্ঞাত নয়। তিনি আদর্শ স্বামী। তাই পিতৃগৃহ থেকে বিদায় নেবার আগে যখন চন্দ্রকলা তাঁর আত্মীয়-পরিজনের কাছ থেকে দূরে চলে যাবেন বলে আক্ষেপ করছেন তখন সূর্যদেব তাঁকে কি বলে যে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, সে পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি। এছাড়া চন্দ্রকলার পিতা-মাতা, ক্রীড়া-সহচরী, সূর্যপুত্র লাউল, কৌতূহলী প্রতিবেশীবৃন্দ, বসন্তদেব, লাউলের পুত্র, ধোপা-নাপিত-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমাজের নানা বৃত্তিভোগী মানুষেরও চরিত্রের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে এই ছড়াটিতে। অনুরূপভাবে প্রবন্ধের গোড়াতেই যে ব্রতটির শৈলী আমরা চিত্রিত করেছি সেখানেও দেবী ভাদুলীকে ছাড়া আমরা পেয়েছি ফুল, ছোট মেয়ে, নাবিক, বুড়ী পড়শী, বাঘ, বনদেবী, কাগা-বগা, আচার্য প্রভৃতি কতই না চরিত্রকে। এমন কি ছড়াটির শেষেও আমরা লক্ষ্য করেছি নাটকীয় পাত্রপাত্রীর এক সমবেত দৃশ্যকেই—

এগুলোয়ে ওগুলোয়ে চন্দন দিলাম
বাপ্ ভায়ের দর্শন পেলাম।

ছড়াগুলিতে ক্লাইমেক্স সৃষ্টির উদাহরণও একেবারে অপ্রতুল নয়। তবে তা প্রায়শঃই অলৌকিকত্বের ব্যঞ্জনায়। তবে 'তুষ-তুষলী' ব্রতের শেষাংশে যে উল্লিখিত হল "তুষলী গেল ভেসে, ধনদৌলত টাকাকড়ি এল হেসে" সেখানে অনেকেই মনে করতে পারেন যে ব্রতগুলি যদি এই ধর্মীয় গণ্ডীর আবরণ থেকে মুক্তি লাভ করত তাহলে নিঃসন্দেহে এগুলির মধ্য দিয়ে নাটকীয় ভাবের যথার্থ

অভিব্যক্তি সাধিত হতে পারত। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে ধর্মীয় গম্ভীর আবরণ থাকলেই যে তা যথার্থ নাটকের পদবাচ্য হতে পারবে না এমন কোন কথা নেই। কারণ তাহলে ত শেক্সপীয়রের বিখ্যাত সব ট্র্যাজেডিগুলিকেই আমাদের অস্বীকার করতে হয়। কিন্তু বাস্তবে তা কি সম্ভব? তাই অলৌকিকত্বের ব্যাপারটি আমাদের কাছে বিচার্য নয়, বিচার্য হল তা কতখানি শিল্পরসমণ্ডিত হয়ে উঠতে পেরেছে সেইটিই এবং সেই বিচারে তুষলীকে জলে ভাসিয়ে দেবার পর যখন সত্যসত্যই দেখা গেল দেবীর আশীর্বাদে ব্রতীনীর স্বামী, পুত্র, শ্বশুর সব ভালোয় ভালোয় ফিরে এসেছেন প্রচুর ধন দৌলতসহ তখন আমরা একটুও অবাক হই না। কারণ বাণিজ্য প্রত্যাগতা তাঁদের পক্ষে এ'চিত্র যে খুবই স্বাভাবিক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ঠিক একইভাবে 'অশত্থপাতা' ব্রতটির কথাও আমরা বলতে পারি। ব্রতটির ছড়াটিতে দেখা যায় এর এক-একটি পাতার রয়েছে এক-একটি আশ্চর্য যাদুগুণ। এর কচি পাতাটি মাথায় দিলে নবকুমার ছেলে হয়, কাঁচা পাতাটি মাথায় দিলে কাঞ্চনমূর্তির অধিকারী হওয়া যায়, এরকম আরও কত কি। কিন্তু এখানেও মনে রাখতে হবে যে কুমারীদের ভাবী জীবনের উজ্জ্বল স্বপ্নের বীজগুলিই এখানে অভিব্যক্ত। ফলে আপাতঅর্থে অলৌকিকত্বের সৃষ্টি হলেও প্রকৃত অর্থে তা হয়নি।

অবশ্য আমাদের জীবনে নৈতিক শিক্ষাদানের উদ্দেশেও যে অনেক সময়ে অলৌকিকত্বের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়েছে ছড়াগুলিতে, তাও স্বীকার করতে হয়। তবে বলার কথা হল এই যে রূপকথা, ভুতের গল্প প্রভৃতি অদ্ভুত রসাত্মক গল্পে আমরা যেমন অতিপ্রাকৃতের স্বাদ পেলেও সে নিয়ে কোন মাথা ঘামাই না, বা সেগুলি গল্পের রসাস্বাদনের ক্ষেত্রেও কোনরূপে বাধার সৃষ্টি করে না, সেইরূপ এই ব্রত ছড়াগুলিও আমাদের কিছুমাত্র বিব্রত করে না। কাহিনীর আকর্ষণে ও ক্লাইমেক্স পরিবেশনায় সেগুলি এমনই আকর্ষণীয় ও নাটকীয়—

নির্ধনের ধন দিতে
কানায় চক্ষু দিতে
নিপুত্রের পুত্র দিতে
ঘোড়ায় চল্‌তে দিতে
হয়েছে এত দেরী।

ব্রতগুলিতে নাটকীয় সঙ্গীতের সংযোজনও লক্ষ্য করার মত। কারণ নাটকে যেমন চরিত্র, পরিবেশ অথবা ভাবকে সঠিকভাবে রূপায়িত করার কারণে সংগীতের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় তেমনি এসব ছড়াতেও সঙ্গীতের ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে অত্যন্ত সার্থকভাবে। বিশেষ করে ছড়াগুলিকে যেখানে পালার মত করে গাঁথা হয়েছে সেখানে। যেমন 'মাঘমণ্ডল' ব্রতটি। এখানে

সূর্যপুত্র লাউলের পালা যেখানে আরম্ভ হল সেখানে কাজের অবসরে লোকজন ও মরানীরা যে গান ধরেছে তা স্পষ্টই বোঝা যায়—

হাঁড়ি পাতিল ঠাকুর ঠুকুর কলসীর কাঁধা
আজ লাউলের বড় হাঁড়ি বাঁধা
হাড়ি পাতিল ঠাকুর ঠুকুর কলসীর কাঁধা
বড় হাড়ি বাঁধা
কলাবাগানে বাঁধা
কাউয়া বলে কা
রাত পোহাইয়া যা।

অবনীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন যে 'কুলাই ঠাকুরের ব্রত' বলেও একটি ব্রত প্রচলিত আছে আমাদের দেশে। এতে পৌষ সংক্রান্তির একপক্ষ পূর্ব থেকে একজনকে বাঘ সাজিয়ে রাখালেরা গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী সন্ধ্যার সময়ে এই গানটি গেয়ে চাল ভিক্ষে করে। গানটিতে কোরাস পর্যন্ত আমরা পাচ্ছি—

সকল—ঠাকুর কুলাই ভোঁ
হ্যাটা লে পাঁচিল পায়
বাঘ—ঝপৎ গিরিরে ॥ ধ্রু ॥
ঝপৎ গিরি সজাগ হয়
সজাগ হয়্যা না করে রব ॥
সকলে—সুন্দের বনেরে ॥ ধ্রু ॥
বাঘ—সুন্দের বনে বাঘের ছাও
হাম্বুর হাম্বুর করে রব
য়্যাক বাঘ রে ॥ ধ্রু ॥
সকলে—ঠাকুর কুলাই কুলাই ভোঁ ইত্যাদি।

ব্রতগুলিতে নাটকীয় দ্বন্দ্ব বা 'conflict'-ও লক্ষ্য করার মত। তবে অধিকাংশ ব্রতেই তা অনুপস্থিত, আবার যেগুলিতে উপস্থিত সেগুলিতেও তা প্রকাশিত হয়েছে অত্যন্ত সীমিত পরিসরে। উদাহরণস্বরূপ আমরা 'মাঘমণ্ডল' ব্রতে চিত্রিত চন্দ্রকলার চরিত্রটির কথা বলতে পারি। চন্দ্রকলা সূর্যের প্রতি প্রেমাসক্ত হওয়ার পর যখন তাঁকে বিবাহ করেন তখন বিবাহান্তে তাঁকে চলে যেতে হবে পতিগৃহের উদ্দেশে। কিন্তু পিতৃগৃহের সঙ্গে এতকালের সম্পর্কও যে একেবারে ত্যাগ করার নয়, তাহলে? তাহলে কি তিনি সূর্যের বাপ, মা, ভাই, বোনকে নিজের বলে গ্রহণ করতে পারছেন না? ফলে এক তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে তার মনে, যদিও তা ব্রতে খুব স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়নি লক্ষ্য করা যায়।

আমাদের ব্রত-নাটকগুলি সমাজজীবনের দর্পনও বটে। কারণ একাধিক

ছড়াতেই তৎকালীন সমাজের নানা উপাদান বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো রয়েছে দেখতে পাই। যেমন 'ভাদ্রলী' ব্রতে রয়েছে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত বাণিজ্য যাত্রার প্রসঙ্গটি—

কাগারে বগারে কার কপালে খাও
আমার বাপ্-ভাই গেছেন বাণিজ্যে
কোথাও দেখ্‌লা নাও।

যৌতুক প্রথারও উল্লেখ পাই 'মাঘমণ্ডল' ব্রতে। সূর্যদেব তাঁর বিবাহে কি কি যৌতুক পেয়েছিলেন তারই পরিচয় মেলে এখানে—

হাতিও পাইলেন, ঘোড়াও পাইলেন, আর মাধবের ঝি
খাট পাইলেন, জাজিম পাইলেন, আর মাধবের ঝি
ঘটি পাইলেন, বাটি পাইলেন
থালা পাইলেন, খোরা পাইলেন আর মাধবের ঝি।

তবে ঐতিহাসিক ও সামাজিক মূল্যেই শুধু নয়, "প্রাগৈতিহাসিক ও আদিম সমাজের" বহুবিধ উপকরণও যে এই ছড়াগুলিতে আত্মগোপন করে আছে, তার উল্লেখ করেছেন সমালোচক। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যই বলেছেন যে অশ্বত্থপাতা, যমপুকুর প্রভৃতি ব্রতগুলিই মূলতঃ ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া দ্বারা বৃষ্টিপাত করিয়ে ধরিত্রীর শস্য-সম্পদ রক্ষা করার প্রবৃত্তি থেকে জাত।

ব্রতগুলির নাটকীয় উপাদান বিচার করতে গেলে সর্বোপরি এর ভাষাকেও আমাদের বিচার করতে হবে। কারণ ভাষাও নাটকের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ব্রতগুলির ভাষা নিরলংকৃত। সংস্কৃত শব্দের কোন ব্যবহারও এখানে প্রায় অনুপস্থিত। নিছকই ছড়ার ছন্দে এগুলি রচিত। গীতি কাব্যিক সুরমূর্ছনা প্রকাশেও এই ভাষা অনন্য।

ব্রতের মতো ব্রতকথাগুলির মধ্যেও ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র নাটকীয় উপাদান। এগুলি গড়ে উঠেছে কোন না কোন কাহিনীকে আশ্রয় করে। প্রত্যেকটিই 'সায়পেন্স' রূপায়ণে অনবদ্য। কাহিনীগুলির আকর্ষণও নেহাৎ কম নয়। এগুলিকে আমরা "বয়স্কদের রূপকথা" বলতে পারি। তবে এর চরিত্রগুলি সম্পর্কে বলা চলে যে সেগুলিতে তেমন কোন বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যের প্রতীক রূপে এক একটি বিশেষ চরিত্রই সেখানে নির্দেশিত। তথাপি ব্রতগুলিতে নাটকীয় উপাদানাদিকে এমনভাবেই সন্নিবেশিত হতে দেখি যে সেগুলির কোন কোনটিকে "স্টেজে সিন্ খাটিয়ে" দিব্বি একদিন দেখিয়ে দেওয়া চলে।" সুতরাং নাটকীয় উপাদানের বিচারে সেগুলি তুচ্ছ জিনিস নয়। আর্টের বিচারে সেগুলি অনন্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের বিজ্ঞানচেতনা

কথায় বলে বিজ্ঞান ও ধর্ম দুই বিপরীত মেরুর বাসিন্দা। একের সঙ্গে অন্যের নাকি প্রায় অহিনকুলের সম্পর্ক। কারণ বিজ্ঞান মূলতঃ জোর দিয়েছে প্রত্যক্ষের ওপর, সুতরাং যা তাঁর কাছে প্রত্যক্ষের অতীত, নিছকই উপলব্ধি সঞ্জাত তাকে সে মেনে নিতে নারাজ। কিন্তু বিপরীতভাবে ধর্মের ঝোঁক রয়েছে অনুভব তথা উপলব্ধির ওপরই। স্বয়ং স্বামীজীও স্বীকার করেছেন, "Feelings is relegion"। কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও আমাদের বিস্মৃত হলে চলবে না যে, যাঁরাই সচেতনভাবে ধর্মকে বলেছেন 'Feelings'-এর ব্যাপার, তাঁরাই আবার অন্যদিক থেকে ধর্মকে অনুভবসিদ্ধ বলে সংজ্ঞায়িত করার সম্পূর্ণ বিপক্ষে। উদাহরণস্বরূপ তাঁরা ভারতীয় দর্শনের সুমহান্ ঐতিহ্যকেই প্রকারান্তরে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যেখানে স্পষ্টতঃই বলা হয়েছে ঈশ্বরকে সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করার কথা। তবে এক্ষেত্রে একজনের পথ হল পর্যবেক্ষণ ও অপরজনের পাথেয় হল বিশ্বাস, যদিও সে বিশ্বাস পর্যবেক্ষণরিক্ত নয়, নিরীক্ষণ বিবর্জিত নয়। ফলে ধর্মতত্ত্বেও গড়ে উঠেছে একপ্রকার বিজ্ঞানমানস। তাই যে স্বামীজী একদিন ধর্মকে বলেছিলেন নেহাতই 'Feelings'-এর ব্যাপার, তিনিই আবার তাঁর 'রাজযোগ' গ্রন্থে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করার কথা। তবে আমাদের আলোচনার বিষয় শুধুই শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে যদিও প্রাসঙ্গিকভাবে সেখানে আরো অনেকের কথাই এসে যেতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি, বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম পুঁথি 'চর্যাপদ' মূলতঃ সাধন সঙ্গীত রূপে আত্মপ্রকাশ করলেও যেমন তার সাহিত্যিক গুরুত্বকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না, তেমনই পারি না ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম মানসিকতাসঞ্জাত বাণীর বিজ্ঞানসুলভ গুরুত্বকে বিস্মৃত হতে। বলা বাহুল্য বর্তমান প্রবন্ধটি সেই আলোচনারই সংক্ষিপ্ত আলোকপাত মাত্র।

'জ্ঞান' বলতে ঠাকুর বুঝতেন কোন বস্তুকে নিছকই সেই বস্তু বলে জানা আর 'বিজ্ঞান' অর্থে বুঝতেন বিশেষ জ্ঞান। অর্থাৎ সেই বস্তুটি যে অন্যান্য সব বস্তু থেকে সম্পূর্ণ পৃথক সেই জ্ঞান। উদাহরণ দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, তাঁকে জানার নাম জ্ঞান আর তাঁর সঙ্গে বিশেষভাবে আলাপ করা তারই নাম বিজ্ঞান। কিন্তু এতেই ক্ষাণ হলেন না তিনি। আবার এক অভিনব উপমা, যেমন পায়ে কাঁটা বিঁধেছে, সে কাঁটাটি তোলবার জন্য আর একটি কাঁটার প্রয়োজন। কাঁটাটা তোলবার পর দুটি কাঁটাই ফেলে দিতে হয়।

প্রথমে 'অজ্ঞান' কাঁটা দূর করবার জন্য 'জ্ঞান' কাঁটাটি আনতে হয়! তারপর 'জ্ঞান-অজ্ঞান' দুইটি ফেলে দিতে হয়। এখানেই বিজ্ঞান।

অর্থাৎ বিজ্ঞানী যিনি, তিনি প্রথমে কোন বস্তুকে না জানা থেকে জানায় এবং তারপর পেঁছন বিশেষ জানায়। তখন প্রকৃত বিজ্ঞানীর কাছে এই বিশেষ জানাটিই বড় হয়ে ওঠে। যেমন জলকে জল হিসেবে জানার থেকে বড় হয়ে ওঠে তার স্বাতন্ত্র্যটি, অর্থাৎ সে যে অন্য সব কঠিন-তরল-বায়বীয় পদার্থ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা সেই দিকটি। সুতরাং আমাদের বিজ্ঞান ভাবনার সঙ্গে ঠাকুরের বিজ্ঞানভাবনাও যে অভিন্ন তা এই দৃষ্টান্তটির মাধ্যমেই প্রমাণিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিজ্ঞানের বাংলা প্রতিশব্দ দিয়েছেন "ঐহিক জ্ঞান"। কারণ সে জ্ঞান ঠাকুরের কাছে সম্পূর্ণ অন্যবস্তু, তা ঈশ্বর সম্বন্ধীয়। তবে গিরিশ ঘোষের সঙ্গে ডাক্তার একদিন "Science Association"—এ যাবার উদ্যোগ করলে শ্রীরামকৃষ্ণও সেখানে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বললেন "আমায় একদিন সেখানে লয়ে যাবে?"

আর একদিন।

সেদিন কথা উঠল কে জ্ঞানী আর কে বিজ্ঞানী সেই নিয়ে। উত্তর দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ—জ্ঞানী নেতি নেতি করে বিষয়বুদ্ধি পরিত্যাগ করে তবে ব্রহ্মকে জানতে পারেন, যেমন সিঁড়ির ধাপ ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ছাদে পেঁছনো যায় ঠিক তেমনি। তবে যথার্থ স্বরূপ তাঁর উপলব্ধ হয় না। কিন্তু বিজ্ঞানী যিনি তিনি বিশেষভাবে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন। তিনি দেখেন ছাদ যে জিনিসে তৈরী, সেই ইঁট, চুন, সুড়কীতে সিঁড়িও তৈরী। সুতরাং নেতি নেতি করে যাঁকে ব্রহ্ম বলে বোধ হয়েছে তিনিই আবার জীবজগৎ হয়েছেন। বিজ্ঞানী তাই দেখেন যিনি নিগুর্ণ তিনিই আবার সগুণ, যিনি ব্রহ্ম তিনিই আবার ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান।

এরপর আবার এক অভিনব উপমা—ছাদে অনেকক্ষণ লোক থাকতে পারে না, নীচে নেমে আসে। যাঁরা ব্রহ্মদর্শন করেছেন তাঁরাও নেমে আসেন। এসে দেখেন এই জীবজগৎ সবই তিনি হয়েছেন। এই চতুর্বিংশতি লীলাতত্ত্ব সব তাঁরই। সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি—এই 'নি'তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না। তখন দেখেন আমি, তিনি, এই জীবজগৎ সব একই। এরই নাম বিজ্ঞান।

কিন্তু এইতেই ক্ষান্ত হলেন না ঠাকুর। আবার এক অভিনব উপমা—ঈশ্বর আছেন এইটি যে জেনেছে তার নাম জ্ঞানী। কাঠে নিশ্চিত আগুন আছে যে জেনেছে সেই জ্ঞানী। কিন্তু কাঠ জেবলে রাঁধা খাওয়া, হেউ ঢেউ হয়ে যাওয়া, যার হয় তার নাম বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানী ঈশ্বরের আনন্দ বিশেষভাবে সম্ভোগ করেছে। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ খেয়েছে কেউ দেখেছে।

বিজ্ঞানী দুধ খেয়েছে আর খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। তাই বিজ্ঞানীর কাছে এই সংসার হল মজার কুটি। আর জ্ঞানীর পক্ষে এ সংসার হল ধোকার টাটি।

আমাদের প্রচলিত বিজ্ঞান ভাবনাকে নিয়েও ঠাকুরের রঙ্গরসিকতা বড় কম ছিল না। তাই একবার অবতার তত্ত্বে ঠাকুর অবিশ্বাসী হলে ভক্তের দল তাঁকে ঘিরে ধরেন। বলেন—যিনি নিরাকার তিনিই যদি সাকার হবেন তাহলে অবতারে অবিশ্বাস করার কি আছে। উত্তরে হাসতে হাসতে বলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, "একথা যে ওদের সায়েন্সে (ইংরাজী বিজ্ঞানশাস্ত্রে) লেখা নেই। এই বলে এক মজার গল্প শোনালেন তিনি—

একজন এসে বললে 'ওহে! ও পাড়ায় দেখে এলুম অমুকের বাড়ী হুরমুড় করে ভেঙে পড়ে গেছে'। যাকে ও কথা বললে সে ইংরাজী লেখা-পড়া জানে। সে বললে, 'দাঁড়াও একবার খপড়ের কাগজখানা দেখি'। খপড়ের কাগজ পড়ে দেখে যে বাড়ী ভাঙ্গার কথা সেখানে কিছুই লেখা নেই। সুতরাং ওসব মিছে কথা।

বিজ্ঞান কথিত প্রত্যক্ষের ওপরেও ঠাকুরের বিশ্বাস ছিল অগাধ। তাঁর একেবারে নিজের মুখেরই কথা "সত্য বলছি অবশ্য তাঁকে দেখা যায়।" নরেন্দ্রনাথকেও বলেছেন তিনি, "তোর চাইতেও আরো স্পষ্ট ভাবে তাঁকে দেখেছি। যদি চাস ত তোকেও দেখাতে পারি।" অবশ্য দেখাতে তিনি পেরেছিলেন কিনা অথবা নিজেও তিনি দেখেছিলেন কিনা সেটা বিশ্বাসের ব্যাপার, কিন্তু ঠাকুরের দৃষ্টিভঙ্গিটি যে অবশ্যই বৈজ্ঞানিকের সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ঠাকুরের একেবারে নিজেরই কথা—শুধু মদ মদ মুখে বললে কি হবে, মাতাল হতে গেলে মদ খাওয়া চাই। তাই ঈশ্বরকে পেতে গেলে শুধু পুঁথি পড়ে কি হবে, তাঁকে চাক্ষুস দেখা চাই। তাই সাধনের প্রয়োজন।

সাধে কি আর ডাক্তার বলেছিলেন বই পড়লে শ্রীরামকৃষ্ণের অত জ্ঞান হত না। 'Faraday communed with nature' প্রকৃতিকে ফ্যারাডে নিজে দর্শন করতো তাই অত 'Scientific truth' আবিষ্কার করতে পেরেছিল। বই পড়ে বিদ্যা হলে অতো হত না। 'Mathemetical formulac only throw the brain into confusion original inquiry'-র পথে বড় বিঘ্ন এসে দেখা দেয়। অবশ্য বিবেকানন্দও পরে বলেছিলেন, 'আমি ত বিজ্ঞান শিখেছি ঠাকুরের কাছ থেকে।' তাই পরবর্তীকালে চিকাগো ধর্মসমিতি সমক্ষে হিন্দু ধর্মের বিশেষত্বের কথা বলতে গিয়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত বিজ্ঞান নির্ভর প্রত্যক্ষবাদকেই উপস্থাপিত করলেন সুললিত ভাষায়।

কিন্তু চার্বাক দর্শন যে ঈশ্বর মানেন না, তাঁরা যে বলেন, এই জগৎ আপনি হয়েছে তাহলে? উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "আরে বাপু মূলে ত সেই একই শক্তি, আর সেই শক্তিরই লীলা।" আমরাও অবশ্য আজ বিজ্ঞানের

দৌলতে জেনেছি সেই একই তত্ত্ব। যে শক্তিকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন ঈশ্বর, ব্রহ্ম ভগবান—তাঁকেই বৈজ্ঞানিকেরা বলেন প্রাকৃতিক শক্তি ও সেই শক্তির লীলাতেই জগতের উৎপত্তি। কিন্তু পরাবিজ্ঞান এখানে আরো একটু যোগ করে বলে, জগৎ ত আর আপনা আপনি উদ্ভূত হতে পারে না। নিশ্চয়ই কেউ প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবহার করে এই বিশাল সৃষ্টিচক্রকে অব্যাহত রাখছে। আর ইনিই হলেন পরাবিজ্ঞানের আধার স্বরূপ স্বয়ং ভগবান, শ্রীরামকৃষ্ণের চোখে যিনি মহাকালী, কালস্বরূপা আদ্যাশক্তি বলে বর্ণিতা।

অবশ্য ঠাকুরের এই বিজ্ঞান ভাবনাকে আরো পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর আদরের শিষ্য নরেন্দ্রনাথ। একবার তিনি গুরুভাই প্রসন্নের সঙ্গে কথাবার্তা প্রসঙ্গে বলেন, "আরে **Chemistry** পড়িস নি, **combination** কে করবে? যেমন জল তৈরীর জন্য **Oxyzen, Hydrozen** আর **Electricity** যে লাগে, তার সঙ্গে **Human hand**-এরও প্রয়োজন হয়। সুতরাং **Intelligent Force** সবাই মানছে।"

সাকার নিরাকার তত্ত্বকেও শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞাননিষ্ঠ উপমায়, "বরফ জমেই জল আর জল জমেই ত বরফ হয় গো। তা বলে জল আর বরফ কি আলদা?" এই বলে এক চমৎকার গল্প শোনালেন তিনি—

একজন লোক বাহ্যে গিয়েছিল। সে দেখলে যে গাছের ওপর একটি জানোয়ার বসে রয়েছে। সে এসে আর একজনকে বললে, দেখ অমুক গাছে একটি সুন্দর লাল রঙের জানোয়ার দেখে এলাম। লোকটি উত্তর দিলে, আমিও বাহ্যে গিয়েছিলাম, আমিও তাকে দেখেছি। তা সে লাল রঙের হতে যাবে কেন, সে যে সবুজ রঙ্। আর একজন বললে, না না আমি দেখেছি হলদে। এইরূপে আরো কেউ কেউ বললে, না সাদা, বেগুনী, হলদে প্রভৃতি। শেষে ঝগড়া। তখন তারা গাছতলায় গিয়ে দেখলে একজন লোক বসে আছে। তাকে জিজ্ঞেস করাতে সে বললে, আমি এই গাছতলায় থাকি। আমি সে জানোয়ারটিকে বেশ জানি। তোমরা যা যা বলছ তা সবই সত্য। সে কখনো লাল, কখনো সবুজ, কখনো হলদে, কখনো সাদা। আবার কখনো দেখি কোন রঙই নেই।

সেইরূপ ভগবানেরও কোন রঙ্ নেই। তিনি কখনো সাকার আবার কখনো বা নিরাকার। তবে আমাদের মন যায় মূলতঃ সাকার বাদেই, তবে তা কুসংস্কার নয়। বিজ্ঞানের সত্য এখানেও নিহিত আছে—

"If a man can realise his devine nature most easily with the help of an image, would it be right to call it a sin? Nor even when he has passed that stage, should he call it

an error ? To the Hindu, man is not traveiling from error to truth but from lower to higher truth."

প্রতীকও তাই। সমালোচক বলেন **concept** ও **sence preception** এই দুইয়ের মিলনেই প্রতীক আত্মপ্রকাশ করে। উদাহরণ দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণও—কেউ জলকে জল, কেউ **water** আবার কেউবা পানি। কিন্তু সকলেই সেই একই ঈশ্বরকে চাইছে। কিন্তু কেন চাইছে। না সব মানুষের মধ্যেই রয়েছে নিজের সসীমতাকে অতিক্রমের মধ্য দিয়ে অসীমতাকে স্পর্শ করার প্রচেষ্টা। এক অবিরত প্রচেষ্টা। বলা ভাল পূর্ণতায় মুক্তির তত্ত্ব আজ বিজ্ঞানও স্বীকার করেছে। কিন্তু প্রতীককে নিয়েই যে যত বিরোধ, যত গণ্ডগোল, তাহলে উপায়? উপায় রূপে তিনি কোন বিশেষ প্রতীকের মধ্যেই গেলেন না, দেখালেন সব ধর্মই সত্য। যত মত তত পথ। প্রতীকই প্রতিমা, প্রতিমাই প্রতীক।

বিজ্ঞান বলে বিচারের কথা। দেখেশুনে তবে এগিয়ে চল। কিন্তু কতক্ষণ? যতক্ষণ সত্য সম্পর্কে আমাদের সম্যক জ্ঞান লাভ হয় ততক্ষণ। ঠাকুরও শোনালেন সেই একই কথা কিন্তু ভিন্ন দৃষ্টিতে—"সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার। কামিনী কাঞ্চন অনিত্য। ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয়। কিন্তু তার দ্বারা ভগবান লাভ হয় না। এরই নাম বিচার বুঝেছ?

মাষ্টার—আজ্ঞে হাঁ। প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক আমি সম্প্রতি পড়েছি। তাতে আছে বস্তুবিচার।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ বস্তু বিচার।"

তবে এবিচার কতক্ষণ? না যতক্ষণ না কলসী পূর্ণ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের উপমায় বিচার করা যতক্ষণ না শেষ হয় লোকে কেবল ফড়্‌ফড়্‌ই করে। তর্ক শেষ হলে আপনি চুপ করে যায়। যতক্ষণ না কলসী পূর্ণ হয় ততক্ষণই কেবল শব্দ। বাস্তব জগতেও আমরা দেখেছি যতদিন না বিজ্ঞান জেনেছে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, ও ইলেক্ট্রিসিটি সরবরাহের মাধ্যমে জল উৎপন্ন হয় ততদিনই কেবল বিচার, বিশ্লেষণ, তর্কবিতর্ক। কিন্তু সে বিচাব আপনিই স্তব্ধ হয়ে গেল যেদিন আসল সত্য আবিষ্কৃত হল, মূল প্রাকৃতিক শক্তির স্বরূপ উদ্ঘাটিত হল।

আর একদিন।

সেদিন কথা উঠল ঈশ্বরের চৈতন্যময়তা নিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন ঈশ্বর সর্বভূতে। তাঁর চেতনায় সকলই চৈতন্যময়। এ বিষয়ে কথামৃতকার শ্রীম আমাদের জানাচ্ছেন—"একদিন পঞ্চবটীর সম্মুখস্থ একটি বিল্ববৃক্ষ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ বিল্বপত্র চয়ন করিতেছিলেন। বিল্বপত্র তুলিতে গিয়া খানিকটা

ছাল উঠিয়া আসিল। তখন তাঁহার এইরূপ অনুভূতি হইল যে, যিনি সর্বভূতে আছেন তাঁহার না জানি কতই কষ্ট হইল। অমনি আর বিল্বপত্র তুলিতে পারিলেন না।" তাছাড়া আরও একদিন "সেদিন ঠাকুর পুষ্পচয়ন করিবার জন্য বিচরণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে কে যেন দপ্ করিয়া দেখাইয়া দিল যে কুসুমিত বৃক্ষগুলি যেন এক-একটি ফুলের তোড়া। এই বিরাট শিবমূর্তির ওপর শোভা পাইতেছে। যেন তাঁহারই অহর্নিশ পূজা হইতেছে। সেদিন হইতে আর ফুল তোলা হইল না।"

বলাবাহুল্য আজ বিজ্ঞানের দৌলতেও আমরা জেনেছি সর্বপ্রাণবাদ তত্ত্বের কথা। জেনেছি গাছেরও প্রাণ আছে। সুতরাং গাছের ছাল ওঠায় যে শ্রীরামকৃষ্ণ গাছের কষ্টের কথা ভেবে নিজেকে ফুল তোলা থেকে বিরত রাখলেন তার একটি বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য অবশ্য আছে।

বিজ্ঞান বলেছে বিজ্ঞান মানলে জ্ঞানকেও মানতে হবে। সেই একই তত্ত্ব শ্রীরামকৃষ্ণ আনলেন একটু অন্যভাবে—যিনি বিজ্ঞানী তিনি জ্ঞানীও। কিন্তু যিনি জ্ঞানী তিনি বিজ্ঞানী নাও হতে পারেন।

কিন্তু কি রকম ?

না, যে ব্যক্তি জল সম্পর্কে শুধু সচেতন অর্থাৎ জ্ঞানী যিনি, তাঁর ঐ তত্ত্বের প্র্যাকটিকাল জ্ঞান নাও থাকতে পারে। (অর্থাৎ জল হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও ইলেকট্রিসিটি সরবরাহের মাধ্যমেই উৎপন্ন এক তরল পদার্থ) কিন্তু যে ব্যক্তি জলকে তার আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্যসহ প্রত্যক্ষ করেছে তাঁর যে জল সম্পর্কে একটি সম্যক জ্ঞান আছে তা অবশ্যই মানতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের অভিনব উপমায়—যিনি বিজ্ঞানী তিনি ব্রহ্মদর্শনের পরও দেখেন, যিনি ব্রহ্ম তিনিই আবার বহু হয়েছেন লীলার জন্যে। কিন্তু জ্ঞানী যিনি যাঁর শুধুই ব্রহ্মোপলব্ধি হয়েছে, তিনি অনেক সময়ে এই তত্ত্ব সম্পর্কে নাও জানতে পারেন।

একবার কথা উঠল জগৎ ও দেহের উৎপত্তি রহস্য নিয়ে। ঠাকুর জানালেন পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগেই জগতের উৎপত্তি। ভগবানও তাই এক থেকে দুই হলেন সৃষ্টির জন্য। পুরুষ ও প্রকৃতি। ঠাকুর আরো জানালেন—যোগমায়া মানেও ঐ পুরুষ-প্রকৃতির যোগ। যা কিছু দেখা যায় সবই ঐ পুরুষ প্রকৃতির লীলা। শিবকালীর মূর্তি, শিবের ওপরে কালী দাঁড়িয়ে আছেন। শিব শব হয়ে মাটিতে পড়ে আছেন। কালী শিবের দিকে তাকিয়ে আছেন। এ সমস্তই পুরুষ প্রকৃতির যোগ। রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির মানেও তাই। নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়েও ঠাকুর বলেছেন—

"সে অবস্থায় অদ্ভুত সব দর্শন হত। আত্মার রমণ প্রত্যক্ষ করলাম। আমার মত রূপ একজন আমার শরীরের ভিতর প্রবেশ করল। আর

ষট্‌পদ্মের প্রত্যেক পদ্মের সঙ্গে রমণ করতে লাগল। ষট্‌পদ্ম মুদিত হয়েছিল। টক্‌ টক্‌ করে রমণ করে তার একটি পদ্ম প্রস্ফুটিত হল। আর ঊর্ধ্বমুখ হয়ে গেল। এইরূপে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, অনাহত, বিশুদ্ধ আজ্ঞাপদ্ম, সহস্রার সকল পদ্মগুলি ফুটে উঠল। আর নীচে মুখ ছিল উর্ধ্বমুখ হল। প্রত্যক্ষ হল।"

বলা-বাহুল্য পুরুষ-প্রকৃতির এই সংযোগেই জগতের উৎপত্তি। আবার রামকৃষ্ণও বিজ্ঞানের মত স্বীকার করেছেন, গতি থেকেই বিশ্ব বিবর্তিত হচ্ছে। গতিও এগিয়ে চলেছে কিন্তু চরম লক্ষ্য তার স্থিতি। ক্রমশঃই একটি অপরিবর্তনীয় ভাবের সমীপবর্তী হবার প্রচেষ্টা। ক্রমশঃই সাম্য, স্থিতি, স্থৈর্য সান্নিধ। একটি ধ্রুব শান্তির দিকে লক্ষ্য। গান যেমন বারে বারে মূলে ফিরে আসে তেমনি সমস্ত গতিও ফিরে আসবে শরণাগতিতে। তার শান্তির মন্দিরে। দুরন্ত ক্লান্ত শিশু যেমন তার মার অঞ্চল-প্রান্তে। অবশ্য বিজ্ঞাননিষ্ঠ এই গতি তত্ত্বের কথা রবীন্দ্রনাথও আমাদের শুনিয়েছেন তাঁর 'বলাকা' কাব্যে। সবই গতিশীল কিন্তু সমস্তই শান্ত বলে প্রতিভাত। রামকৃষ্ণও তাই গতির মধ্য দিয়ে, যোগের মধ্য দিয়েই দেখতে চাইলেন গোটা সৃষ্টিটাকে।

দেহতত্ত্ব নিয়েও ঠাকুর বললেন স্থূলদেহ আর সূক্ষ্মদেহ। ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই নিয়ে আমাদের স্থূল দেহ আর সূক্ষ্মদেহের সৃষ্টি মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত নিয়ে। এইটি মনে রাখতে হবে। এখানেও ঠাকুরের দৃষ্টি রয়েছে প্রাকৃতিক সত্যের দিকে। মৃত্যুর পর দেহ পঞ্চভূতেই বিলীন হয়।

বিজ্ঞান বলে শব্দ বিজ্ঞানের কথা। এক শব্দ অনর্গলিত উত্থিতমান। আর একেই ঠাকুর বলে বসলেন নাদ ব্রহ্ম। ঠাকুরের মতে ধ্বনি প্রণব থেকে আসছে। যেমন উপমা দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ—ঘণ্টার টং শব্দ। ট-অ-অ-অ-ম-ম। লীলা থেকে নিত্যে লয়। স্থূল সূক্ষ্ম থেকে সব মহাকারণে লয়। জাগ্রত স্বপ্ন, সুষুপ্তি থেকে তুরীয়ে লয়। এ এক চমৎকার ব্যাপার। আবার ঘণ্টা বাজল। যেন মহাসমুদ্রে কোন গুরু জিনিস পড়ল, আর ঢেউ আরম্ভ হল। নিত্য থেকে লীলার শুরু হল। মহাকারণ থেকে স্থূল, সূক্ষ্ম কারণ শরীর দেখা দিল। সেই তুরীয় থেকেই জাগ্রত স্বপ্ন, সুষুপ্তি সব অবস্থা এসে পড়ল। আবার মহাসমুদ্রের ঢেউ মহাসমুদ্রেই লয় হল। নিত্য ধরে ধরে লীলা আর লীলা ধরে ধরে নিত্য। চিদাকাশে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি আবার ঐতেই লয় হয়। এখানে ঠাকুরের উক্তি আমাদের বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি তত্ত্বের সঙ্গেও যেন অনেকটা মিলে যায়। বিজ্ঞানও জানিয়েছে সৃষ্টির আদি অবস্থায় ঠিক এভাবেই প্রাকৃতিক সংঘর্ষ ঘটেছিল। মহাসমুদ্রের ঢেউ মহাসমুদ্রেই

লয় হয়ে প্রলয়ের সৃষ্টি করেছিল। আর তা থেকেই ধীরে ধীরে উৎপত্তি ঘটেছিল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের।

তবে থিয়োসফি সম্পর্কে ঠাকুর নীরব ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ শ্যামবসুর সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের অংশটি উদ্ধার করা গেল।

শ্যামবসু—তাঁরা (থিয়োসফিস্টরা) হিন্দুধর্ম পুনঃস্থাপিত করার চেষ্টা করছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি তাদের বিষয় ভাল জানি না।

শ্যামবসু—মরবার পর জীবাত্মা কোথায় যায়, চন্দ্রলোকে না নক্ষত্রলোকে এসব থিয়োসফিতে বেশ যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা হবে। তবে আমি তিথি, নক্ষত্র অত কিছু জানি না।

কিন্তু জ্যোতিষ বিজ্ঞানে যে ঠাকুরের আস্থা ছিল, সে সম্পর্কে শ্রীমই আমাদের পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

সমাধিকেও বিজ্ঞাননিষ্ঠ ভাবে প্রমাণ করেছেন তিনি ডাক্তারের কাছে। তারপর বুঝিয়ে বলেছেন, বেদান্তের পঞ্চকোষের সঙ্গে এই সমাধির বেশ মিল আছে। স্থূলশরীর অর্থাৎ অন্নময় বা প্রাণময় কোষ ও সূক্ষ্মশরীর বা মনোময়, বিজ্ঞানময় কোষ। আবার কারণ শরীর অর্থাৎ মহাকারণ পঞ্চকোষের অতীত। মহাকারণে যখন মন লীন হয় তখনই হয় সমাধি। এর নাম নির্বিকল্প বা জড়সমাধি।

একদিন বিজ্ঞানের আলোচনায় উঠল ইচ্ছাশক্তির প্রসঙ্গও। শ্রীরামকৃষ্ণ জবাব দিলেন "তা অবশ্য আছে কিন্তু কিরকম জান"—বলেই বেদান্তের এক বিজ্ঞাননিষ্ঠ উপমা দিলেন তিনি। বুঝিয়ে দিলেন 'willforce' আমাদের সকলেরই আছে ঠিকই কিন্তু তার একটি গণ্ডীও আছে। সে গণ্ডীর বাইরে আমরা কেউই যেতে পারি না। বিজ্ঞানও বলেছে বিশ্বের সব শক্তিই অপরিবর্তিত, সেই শক্তিতে টান পড়লেই আবার।

যেমন একটি হাড়িতে চাল চড়ানো হয়েছে। আলুবেগুন সব ভাতে দেওয়া হয়েছে। খানিক পরে আলু বেগুন চালগুলি লাফাতে থাকে। যেন অভিমান করে বলে 'আমি নড়ছি', আমি লাফাচ্ছি। ছোট ছেলেরাও দেখলে ভাবে আলু বেগুন চাল ওরা বুঝি লাফাচ্ছে'। কিন্তু যাঁর প্রকৃত জ্ঞান হয়েছে একমাত্র তিনিই জানেন এরা কেউই জীয়ন্ত নয়। হাঁড়ির নীচে আগুন আছে বলেই ওরা লাফাচ্ছে। আগুন সরিয়ে নিলেই আবার।

সবের পর শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের শোনালেন শিব ও শক্তির কথা। পুরুষ ও প্রকৃতির তত্ত্ব। শিব অর্থে চেতনা, শক্তি বিজ্ঞান। কালীমাতা জগন্ময়ীকে দেখ। দেখবে শক্তির কাছে চেতনা ধরাশায়ী। তাই প্রয়োজন চেতনার। বিজ্ঞানের নবলব্ধ আবিষ্কারে মত্ত হয়ে তার অপপ্রয়োগে নয় বরং মানব

কল্যাণেই তাকে নিয়োজিত করা। তাই কি সন্দরভাবে প্রয়োগের ইঙ্গিতটিও দিয়ে দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ—

"তোদের চৈতন্য হোক"।

আর এভাবেই পরমসত্যকে, পরমবিজ্ঞানকে চিনিয়ে চলেন তিনি। পরিণত হন আমাদের অতি আপনার জনে।



আধুনিক বাংলা কাব্য—কবিতায় কলকাতা

বর্তমান প্রবন্ধের শিরোনাম 'আধুনিক বাংলা কাব্য কবিতায় কলকাতা' হলেও বাংলা কাব্যে কলকাতার উল্লেখ অতো পরবর্তী কালের নয়। কারণ মধ্যযুগের সাহিত্য প্রাঙ্গণে যেমন কলকাতার কথা বর্ণিত হয়েছে তেমনি ঈশ্বর গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখদের কাব্যেও কলকাতার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। তবে কলকাতা তাঁদের কাব্যে নিছকই সরস ও প্রত্যক্ষ বাস্তবেরই নমুনা মাত্র, আধুনিক যুগের দ্বন্দ্ব জটিলতাময় জীবনের পরিচয়ও সেখানে তেমনভাবে বিদ্যমান নেই। তাই স্বাভাবিকভাবেই কবি জীবনানন্দ, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবিরা পরবর্তী কালে যেভাবে কলকাতাকে দেখলেন তাঁদের সঙ্গে পূর্ববর্তী ঐ কবিদের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য রয়ে গেছে প্রায় আকাশ পাতাল। অর্থাৎ কলকাতা তখন আর শহর হিসেবেই শুধু নয়, আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে তাল রেখে তার রূপক স্বরূপেই আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে। তাই কারো কবিতায় কলকাতা শহর হলেও ব্যক্তি, কারো কাছে বা দুঃস্বপ্নের নগরী, মিছিলের নগরী, আবার কারো কাছে বা কল্লোলিনী তিলোত্তমা। আবার কেউবা কলকাতার 'ঐতিহাসিক চিত্রের বিস্তার দানের প্রচেষ্টায়' তাকে নিছকই চিত্রকল্প হিসেবে ব্যবহার করেছেন তাঁদের কবিতায়।

কলকাতাকেন্দ্রিক এইরূপ কবিতার সংখ্যা অসংখ্য। কলকাতার সরাসরি উল্লেখে যেমন বহু কবিতা পাওয়া গেছে তেমনি কলকাতার রাস্তাঘাট, যানবাহন, দর্শনীয় স্থান প্রভৃতির উল্লেখেও পরোক্ষভাবে কলকাতাকে উপস্থাপিত হতে দেখা গেছে কারো কারো কবিতায়। তবে সেসব কবিতার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অল্প।

আরও একটি কথা। কলকাতাকে নিয়ে যেমন কোন কোন কবি অবিমিশ্র প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন তেমনি কেউবা কলকাতার বিরুদ্ধে তীব্র শ্লেষও বর্ষণ করেছেন তাঁদের কবিতায়। অবশ্য উভয়েরই যুক্তি আছে। এখানে যাদুঘর, মনোরম মন্দির, বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ম্, চিড়িয়াখানা প্রভৃতি যেমন আছে, তেমনিই আছে পথঘাটে যানবাহন সমস্যা, জীর্ণ রাস্তাঘাট, ধুলোর আস্তরণ অথবা সামাজিক সমস্যা। তথাপি একটা কথা বেশ পরিষ্কার যে এঁরা সকলেই কলকাতা প্রেমিক। নিন্দাবাদ ত মানসিক আক্ষেপেরই ফল। তাই ব্যাজস্তুতির মাধ্যমে কখনো ঝরে পড়েছে তাঁদের সেই আক্ষেপ মিশ্রিত ভালবাসা, যে ভালবাসা প্রকাশ পায় "তীব্র ক্রোধে, গভীর প্রেমে" অথবা মানুষের প্রতি মানুষের অন্তহীন ভালবাসার তাগিদে। মূল কেন্দ্রবিন্দুতে তাই সকলেই এক, প্রকাশিত শিল্প নৈপুণ্যে যতই না কেন একের সঙ্গে অপরের

বিস্তর পার্থক্য থাকুক। এইবার আমরা বিভিন্ন আধুনিক কবির চোখে কলকাতা কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সেই বিষয়েই সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করব।

প্রথমেই ধরা যাক কবি জীবনানন্দের কথা। পাশ্চাত্যের কবি এলিয়ট যেমন 'দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এর চিত্রকল্পে বর্তমান বন্ধ্যা যুগকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তেমনি জীবনানন্দও কলকাতার মাধ্যমে দেখেছেন বর্তমানের চলমান জীবনকে। আবার কখনো বা সেই দৃষ্টিতে এসে মিশেছে কবির ইতিহাস চেতনা ও ভৌগোলিক পর্যবেক্ষণ। আরো বলা চলে যে কলকাতা তার কাব্যে শুধুমাত্র একটি শহর রূপেই উল্লিখিত হয়নি, বরং কলকাতা তার শরীরী মূর্তি নিয়েই আবির্ভূত হয়েছে জীবনানন্দের সমগ্র কাব্য সাধনায়। তাঁর কাছে কলকাতা শুধু বিষাদের প্রতিমূর্তিই নয় তা আনন্দদায়িনী শক্তিরই অদ্বিতীয় প্রকাশ। আজ না হোক একদিন তার সে রূপ প্রকাশ পাবেই। তিনি অস্তিত্ববাদী।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে তাঁর "বনলতা সেন" কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'পথ হাঁটা' কবিতাটি। কবিতাটিতে বর্তমানের "চলমান জীবনের বক্রিমায়" আমরা মূর্ত হয়ে উঠতে দেখি কলকাতা শহরকে যে শহরের পথে পথে কবি হাজার হাজার বছর ধরে পথ পরিক্রমা করে চলেন অনায়াসে—

এক রাশ তারা আর মনুমেন্ট-ভরা কলকাতা ?
চোখ নীচে নেমে যায়-চুরুট নীরবে জ্বলে—বাতাসে অনেক ধুলো খড় ;
চোখ বুজে একপাশে সরে যাই-গাছ থেকে অনেক বাদামী জীর্ণপাতা
উড়ে গেছে ; ব্যাবিলনে একা একা এমনই হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর
কেন যেন, আজো আমি জানিনাকো হাজার হাজার ব্যস্ত বছরের পর।

কলকাতার চলমান জীবনকে কবি ব্যঙ্গও করেছেন তাঁর 'ফুটপাতে' কবিতায়। কারণ কবিতাটির আদ্যপ্রান্তেই ছড়িয়ে রয়েছে কলকাতার পরিবেশের প্রতি কবির বিরাগ। এখানকার পরিবেশের সঙ্গে গ্রাম্য জীবনের সেই পেঁচা, আমলকির ডাল, রাত্রির মায়াবী স্পর্শ, কোন কিছুরই কোন যোগ নেই। কলকাতার সবটাই যেন কৃত্রিম ও যন্ত্রনির্ভর। গ্রাম্য জীবনের রহস্যময় পরিবেশে রাত্রির যে বিচিত্র ঐকতান সৃষ্টি হয়, এখানে তাও হয় না—

কলকাতার ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে—ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে
কয়েকটি আদিম সার্পিণী সহোদরার মতো
এই যে ট্রামের লাইন ছড়িয়ে আছে
পায়ের তলে, সমস্ত শরীরের রক্ত এদের বিষাক্ত বিস্বাদ স্পর্শ
অনুভব করে হাঁটছি আমি।

কলকাতার এই যন্ত্রসর্বস্বতা উপহসিত হয়েছে জীবনানন্দের 'রাত্রি' কবিতাতেও—

একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে।

রাত্রি এখানে মূলতঃ কলকাতা মহানগরীর অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনেরই প্রতীক। তাই রাত্রির প্রতীকেই কবি উপস্থাপিত করলেন কলকাতার পটভূমিতে এক আন্তর্দেশীয় জীবনাবর্ত্তের আবহ। সেখানে কুষ্ঠ রোগীর হাই ড্র্যাণ্ট খুলে জল চেটে নেওয়া, রাত্রির দ্বিপ্রহরে কলকাতার ফিয়ারলেন, ছুটন্ত তিনটি রিকশ'র যাদুমন্ত্রে গ্যাস ল্যাম্পের সঙ্গে মিশে যাওয়া প্রভৃতি সবই এখানকার বিপর্যস্ত মূল্যবোধেরই অনিবার্য প্রকাশ। তথাপি নগর জীবনের বাণিজ্যিক লেনদেন, কোলাহল মুখরতা ও অর্থগৃধ্নুতার চিত্র যেমন কলকাতায় আছে তেমনি রোমাণ্টিক বিলাসের মাধ্যমে তার জান্তব প্রবৃত্তিকেও বিস্মৃত হতে পারেন না কবি—

নগরীর মহৎ রাত্রিকে মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।
তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব-অবৈতনিক
বস্তুতঃ কাপড় পরে লজ্জাবশত।

কবির এই সমাজ সচেতনতার কথা তাঁর "সাতটি তারার তিমির" কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'বিভিন্ন কোরাস' কবিতাটিতেও বিদ্যমান। যেখানে ১৯৪২-এর দুর্ভিক্ষে কবি শহরের পথে পথে উঠতে দেখেছেন চাষীদের অসংখ্য মৃতদেহকে। কবি বলেছেন—

নগরীর রাজপথে মোড়ে মোড়ে চিহ্ন প'ড়ে আছে ;
একটি মৃতের দেহ অপরের শবকে জড়ায়ে
তবুও আতঙ্কে হিম—হয়তো দ্বিতীয় কোন মরণের কাছে।

কিন্তু তবুও কবি আশাবাদী। তিনি তিমিরবিলাসী নন, তিমিরবিনাশী। তাই স্বপ্ন দেখেন কলকাতা ঠিকই একদিন 'কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে'।

কবি জীবনানন্দের পরেই বলতে হয় কবি সুধীন্দ্রনাথের কথা। তিনি "নাস্তিবাদ ও পরে ক্ষণবাদী জীবনদর্শনের যে পথ দেখিয়েছেন তা বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে সম্পূর্ণ নতুন।" তাঁর সঙ্গে জীবনানন্দেরও মিল অনেক। তাঁরা উভয়েই সমাজ সচেতন ও সেই সচেতনতা গভীর বেদনাবোধে উভয়ের কাব্যেই উচ্ছ্বসিত। তবে যুগ-যন্ত্রণাকে প্রকাশ করার অথবা করতে না পারার ব্যর্থতা নিয়ে তাঁরা কেউই পলায়ন করেননি সেই সুখের জগতে। তাই কলকাতাকেন্দ্রিক একাধিক কবিতাতেই সুধীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন সমাজের বিয়োগাত্মক প্রেক্ষাপটকে। তাঁর 'বিরাম' কবিতায় আছে—

জানি জানি মুহূর্তেই জাগবে কলিকাতা ;
চলবে চাকার ঘর ঘরানি ; পথে পথে জ্বলবে গ্যাসের আলো,
দোকান-পাট আবার শুরু হবে।

ঘর-করা আর চেঁচামেচি, গলি-ঘুঁজির ধারে
খড়ি-মাখা বেশ্যারা ফের কাষ্ঠ হেসে থাকবে পেতে ওৎ
ছাত্র, মাতাল, মজুর, কুলির আশায়,
ভিক্ষা মেগে মেগে
ফিরবে আবার ঠক, জুয়োচোর, কানা, খোঁড়া, কুষ্ঠরোগীর দল ॥

কিন্তু কলকাতা সম্পর্কে এই নঙর্থক দৃষ্টিভঙ্গি সহজেই রূপান্তরিত হয় রোমান্টিক স্বপ্নবিলাসে। তাই অতিমাত্রায় সমাজসচেতন ও প্রতীকী ধর্মে বিশ্বাসী কবি সুধীন্দ্রনাথ সহজেই বলতে পারেন—

চলছে ট্রাম দৌড়েছে বাস, হচ্ছে উধাও মোটর গাড়ী হেঁকে ;
*   *   *   *   *
ঐ যুবতীর প্রগল্‌ভ রূপ পঞ্চভূতের মাঝে
লুপ্ত হবে যেদিন একেবারে,
সেদিন ফের নবীন কবির দ্বারে
আসবে শিমুল ফাগুন বেলার আগুন বহন ক'রে
ওরে কবি, এই অমৃতে নে তোর প্রাণের স্মৃতির অভাব ভরে।

কবি অমিয় চক্রবর্তীও সমাজসচেতন কবি। তাই বারবারই তিনি মানুষের ফাঁপা অহংকার, ধর্মধ্বজীর ভণ্ডামি, প্রগতির ভানকে নিয়ে হাস্যকর অথচ করুণ চিত্র অঙ্কন করেছেন তাঁর কবিতায়। যেমন 'একমুঠো' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত তাঁর 'প্রাগতিক' কবিতায় আছে কলকাতার কালীঘাট অঞ্চলের সেই সব মানুষের চিত্র, যাঁরা আপাত অর্থে ধর্মধ্বজী হলেও প্রকৃত অর্থে সেটা তাঁদের ভান। তাই পরক্ষণেই পোশাক বদলিয়ে রেসের মাঠে নামতেও তাঁরা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। অবশ্য এই জাতীয় কবিতায় কলকাতা প্রেক্ষাপট হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে লক্ষ্য করা যায়।

আবার ১৩৫০-এর মন্বন্তরে কলকাতার পথে পথে চাষীদের মৃত্যু দেখে কবি যে আধুনিক সভ্যতার চরম ঔদাসীন্যকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সে সম্পর্কে তাঁর 'অন্ন দাও' কবিতায় বর্ণিত হয়েছে—

মূর্ছা চোখের অন্ন দাও,
বোবা মুখ বলে, অন্ন দাও,
কোথাও পাথর ভাঙে না, ঝরে না অন্ন জল,
কঠিন শহরে অন্ন নেই।

আসলে অমিয় চক্রবর্তীর কবিমানস চিরকালই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ। একটা সামাজিক আলোড়নে আলোড়িত। তাই গান্ধীজীর পাশাপাশি কলকাতার উপদ্রুত অঞ্চলগুলি পরিভ্রমণ করেও তিনি বুঝেছিলেন এর কোন আশু সমাধান

নেই। তাই বারবারই কবি কণ্ঠে ধ্বনিত হয় তৎকালীন কলকাতার ঐতিহাসিক চিত্রের বিস্তারিত বিবরণ। তাঁর 'অন্নদাতা' কবিতায় আছে—

পাথরে মোড়ানো হৃদয় নগর
জন্মে না কিছু অন্ন—
এখানে তোমরা আসবে কিসের জন্যে ?

*   *   *   *

আসো যদি তবে শাবল হাতুড়ি
আনো ভাঙবার যন্ত্র,
নতুন চাষের মন্ত্র।

*   *   *   *

জয় করো এই শান বাঁধা কলকাতা।

অথবা কলকাতার বড়বাবুকে নিয়েও ব্যঙ্গ উচ্চারিত হয় এই বলে—

ছাতা পড়া প্রাচীন ভিটে, হাত-দেখানো ইঁটে,
বাবুগিরির ঢেউ জাগে তাও—সংসারে কালসিটে।
কলকাতার এই পাশাপাশি বনেদি নোংরামি,
শূন্য পুকুর ব্যাঙের গুমোর বড়ো বংশের আমি।

আবার গ্রাম্য মানুষের বিশেষতঃ শিশুদের কাছে যে কলকাতা কতখানি আকর্ষণীয় তারও উল্লেখ করেছেন তিনি 'কথাবন্ধ' কবিতায়। কারণ গ্রামের শিশুর কাছে কলকাতার আকর্ষণ অনেকটা রূপকথার প্রতি শিশুমনের দুর্বার আকর্ষণের মতই। এখানকার ট্রামগাড়ি, ভিড় ঠেঙিয়ে তাতে ওঠানামা, রাস্তার যানজট সমস্যা, মনোহারি সব সিনেমা হল সব মিলিয়ে কলকাতায় বেড়ানোই যেন গ্রামের মানুষের কাছে হয়ে ওঠে একটা বড়কীর্তি। অমিয় চক্রবর্তী লিখেছেন—

মার কাছে ছেলে কতো বলে কথা
একলা-বেড়ানো কীর্তি শহরে তার।
না থামতে জোড়ে ট্রামে ওঠানামা,
রাস্তার ভিড়, চীনে গোরা ঘোরে—
হন্ হন্ চলি,
হঠাৎ জানো, মা,
বাঘের মতন দুটো বুলডগ নিয়ে
সিনেমার ধারে দাঁড়িয়ে কে ছিল,
ফিরেই চাইনি, জানো জানো ঢুকে
দোকানে কিনেছি পেন্সিল্।

কলকাতাকে নিয়ে স্বপ্ন অমিয় চক্রবর্তী'ও দেখেছেন। কারণ অন্ধকারের জন্যই যে আলোর এত কদর সে সত্য তাঁরও অজ্ঞাত নয়। তাই দেখাই যাক না যাঁর চোখ—'স্বর্ণচাকনির ওধার থেকে' অভিনব প্রাচীন আমাদের কলকাতা।

প্রসঙ্গতঃ কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের কথাও বলতে হয়। তাঁর অনেক কবিতাতেই আমরা কলকাতাকে ব্যক্তি হিসেবে পাই ঠিক যেমনটি পাই কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়। আবার কলকাতার মানুষজন, তাঁদের জীবনযাপন পদ্ধতি, নানাবিধ সামাজিক সমস্যা প্রভৃতিও প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত হয় তাঁর নানা কবিতায়। কিংবা কলকাতাকে চিত্রকল্প হিসেবে ব্যবহার করেও তার যান্ত্রিক সভ্যতার বাইরে একটি ব্যাপ্তির জন্যেও আকুলিত হতে দেখা যায় কবিকে। আবার কবি বুদ্ধদেব বসু যেমন আলকাতরা, পেট্রোল, যানজট প্রভৃতির আধারে কলকাতার চিত্র এঁকেছেন, তেমনি কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতাতেও তার অনুসৃতি লক্ষ্য করা যায় বিশেষভাবে। তাঁর 'কেউনা' কবিতায় আছে—

যেখানে যাও,
পেট্রোল আর ডিজেল ধোঁয়ার
খুনে গন্ধ
পাপের মতো টানে,
সঙ্গে ফেরে বিষের মতো চৌরঙ্গী।

কলকাতাকে ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করেও তাঁর 'শহর' কবিতায় লিখিত হয়েছে "আমার শহর নয়কো তেমন বুড়ো।" এখানকার সবুজ ঘাসের রূপকেও প্রকাশিত হয়েছে কলকাতার মানুষের নৈরাশ্য পীড়িত জীবনের কথা। কিন্তু তথাপি কবি আশাবাদী। তাই বিভিন্ন রূপকে, চিত্রকল্পে, মানসিক টানাপোড়েনের অভিঘাতে কলকাতাকে নিয়ে তিনি যতই না কেন হতাশার শিকার হন, কলকাতাকে ঘিরেও তাঁর অনেক স্বপ্ন আছে। কেননা তিনিও কলকাতা প্রেমিক—

একদিন এশহরও হবে বুঝি সুদূর মধুর
আর সব মুছে গিয়ে
জাগবে শুধু গম্বুজ, মিনার,
রেসকোর্স, রেডরোড, ইডেন গার্ডেন
মেমোরিয়াল থেকে মনুমেণ্ট।

কবি অন্নদাশঙ্কর রায়ের কবিতাতেও কলকাতার কথা আছে। যেমন তাঁর 'মূর্তিবদল' কবিতায় কলকাতার গড়ের মাঠ, পার্কস্ট্রীট প্রভৃতি জায়গার উল্লেখে কলকাতার উপস্থিতি বিশেষভাবেই বিদ্যমান। তবে প্রতীকী ব্যাপারটি সেখানে তেমন ভাবে উল্লিখিত নয়, নিছক শহর হিসেবেই কলকাতার উপস্থিতি সেখানে লক্ষণীয়। তাঁর 'মূর্তিবদল' কবিতায় আছে—

তোমরা বলো, যাও সাহেব।
আমরা বলি, আও সাহেব
গড়ের মাঠের মূর্তি নিয়ে

লেনিন আসুন, তাও সাহেব।
পার্ক স্ট্রিটের মাথায় বসুন
চেয়ার পেতে মাও সাহেব।

কবি বুদ্ধদেব বসুও আধুনিক কবি। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ম তীব্র জেহাদ ঘোষণা করে তিনি তাঁর জয়যাত্রা শুরু করলেও বারবারই তাঁকে ফিরে যেতে হয় রবীন্দ্রনাথের জগতে। তাঁর সৌন্দর্যপিয়াসী মনও কলকাতার আকণ্ঠ সৌন্দর্যরস পানে বিমোহিত। অবশ্য পাশ্চাত্য সাহিত্যও তাঁকে অনেকটা প্রভাবিত করেছে। তাই ইংরেজী সাহিত্যের সাহিত্যিকেরা যেমন অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের রাজধানীকে প্রধান বর্ণিতব্য বিষয় করে তুলেছিলেন, যেমন ডিকেন্সের রচনায় আছে লণ্ডন শহরের কথা অথবা টলস্টয়ের রচনায় আছে মস্কো ও পেট্রোগ্র্যাডের প্রসঙ্গ, তেমনি কবি বুদ্ধদেবও বর্তমানের যুগজীবনকে প্রকাশ করেছেন কলকাতারই চিত্রকল্পে। তাই কলকাতার পেট্রোল, আলকাতরা, সকাল বেলায় আলো জ্বালিয়ে ট্রাম চালানো, সবেতেই প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর অপূর্ব সব সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি। তথাপি রোমাণ্টিক মনের পরিচয়ও যে তাঁর নেই তা বলা যাবে না। তাঁর 'ঘাস' কবিতাতেই আছে—

ট্রামের রাস্তায় ঘাস
বালিগঞ্জে ঃ
নির্জন কল্পনা ফোটে মনের মালঞ্চে,
মাস-পয়লার বিকেলগুলো
কবিতার পাতা হয়ে মেতে ওঠে রঙ্গে।

কবির 'স্বপ্নের উজ্জয়িনী' এই কলকাতা কখনও বা যন্ত্রসভ্যতার প্রতীক আমেরিকার সঙ্গেও অভিন্ন—

তোমার রক্তের সমুদ্রের ছন্দে জাগিয়ে রেখে জ্বালিয়ে তুলে
আমাকে সার্থক করেছ তুমি—আমার উজ্জয়িনী আমার আমেরিকা
—কলকাতা!

দীপ্তি ত্রিপাঠী মন্তব্য করেছেন, কলকাতার মত একটি অতি পরিচিত নাম, যাতে সঙ্গীত ধর্ম প্রায় কিছুই নেই, সেই নাম যে কতখানি সৌন্দর্যের আলেয়া হয়ে উঠে ব্যঞ্জনার গভীরতা আনতে পারে তা বুদ্ধদেব বসুর কাব্যেই দেখা গেল সর্বপ্রথম। তাঁর একটি কবিতায় আছে—

কলকাতায় ঝড়ে একফোঁটা মধু
অসীমের শতদলে।

অথচ কবি বুদ্ধদেব বেশ জানেন, কলকাতার সেই পূর্ববর্তী চিত্র এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, এখন যন্ত্রসভ্যতার প্রতীক কলকাতাকে গ্রাস করেছে ইলেকট্রিক বাতি, মাইক অথবা ট্রাফিক জ্যামের মত নানাবিধ সমস্যা। তথাপি

চির সৌন্দর্যের প্রতীক কলকাতায় যে এখনও কোকিল ডাকে, দক্ষিণী হাওয়া বয় সে সত্যও কবি বিস্মৃত হতে পারেন না। তাই আশাবাদে ভরপুর কবি বুদ্ধদেবও তার প্রশংসা না করে পারেন না। তাঁর 'এখন বিকেল' কবিতায় আছে—

এখনও বিকেল আসে চুপে চুপে কলকাতায়,
এখনও কোকিল ডাকে হঠাৎ-ব্যথার মতো
দক্ষিণে হাওয়ায়।

কলকাতার পুনরুজ্জীবনও তিনি প্রার্থনা করেছেন তাঁর 'কলকাতা' কবিতায়—

ফিরে এসো আমার স্বপ্নের কলকাতা-আজও তো এই কথাই বলি,
*　　*　　*　　*
গঙ্গা থেকে বিশ্বের উপকূলে অবারিত হোক বাণিজ্য
তোমার সম্পদে, চিন্তায়।

কিন্তু কবি বিষ্ণু দে বুদ্ধদেবের মত অতটা রোমান্টিক নন। হয়তো এমনও হতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ কিংবা বুদ্ধদেবের মত তিনিও চেয়েছিলেন "আনন্দ শুধু আনন্দ নিষ্যন্দন আকাশ" তথাপি পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও তার আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট এর বিরোধী বলে সেই কাব্যাদর্শের বিরুদ্ধে কবিকে ছেদ টানতে হয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথ অথবা বুদ্ধদেবের মত তাঁর সন্ধ্যাবর্ণনায় কোনরূপ রোমান্টিক আমেজ সৃষ্টি হয় না, বরং যন্ত্রের শৃঙ্খলে বন্দী মানবত্বের অসহায়ত্ব ও তার নভোবিহারের চিত্রকল্পেই কবি আধুনিক যুগ ও রবীন্দ্র যুগের মধ্যে দুস্তর পার্থক্যকেই রূপায়িত করে তোলেন। সমালোচকের এই কথা যথার্থ। তাঁর 'টপ্পা ঠুংরী' কবিতায় আছে—

বড়ো বাজারের উপল উপকূলে
জনগণের প্রবল স্রোত
উগারিছে ফেনা
আর বিড়ির আর সিগারেটের আর উনুনের আর মিলের ধোঁয়া।

শুধু কি তাই? রাত্রিদিন এখানে সবই সমান। কোনরূপ বর্ণবৈচিত্র্যও এখানে অনুপস্থিত। শোকাতুর মরুভূমির মতই এখানে জলাভাব। তাই শেষপর্যন্ত আর কোন উপমা খুঁজে না পেয়ে কবি মরুভূমির চিত্রকল্পেই প্রকাশ করলেন কলকাতার বাস্তব অবস্থাকে—

রাত্রিদিন একাকার, ঘুম নেই জলের প্রলাপে,
অস্থিসার কলকাতায় শোকাতুর মরুভূমি।

"পূর্বলেখ" কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'খিদিরপুর' নামক কবিতাতেও তিনি বর্ণনা করেছেন কলকাতারই একটি পরিচিত জায়গা খিদিরপুরকে, যেখানে—

গান কোথা? ঊর্মিচারী ক্রৌঞ্চ শরাহত!

আলকাতরা, কয়লাকুচি, ধোঁয়া আর তেল।

কিন্তু তবুও কবির শপথ বাক্য উচ্চারিত হয় এই বলে, 'কলকাতা ফের গড়ে নিতে হবে দুজনে।' কারণ কলকাতাকে কল্লোলিনী তিলোত্তমা করে গড়ে তোলার স্বপ্ন জীবনানন্দের মত রয়েছে কবি বিষ্ণু দে'রও। তাই আজ আর কোন কথা নয় কেবল—

ভেঙে ভেঙে কলকাতায় গলিত নিষেধ

* * * *

ধুয়ে দাও কলকাতার গলিত সন্তাপ
হাওয়ায় হাওয়ায়।

কবি দিনেশ দাসও আধুনিক কবি। তাঁর কবিতাতেও কলকাতার দৈনন্দিন জীবনের কথা বর্ণিত হয়েছে অতি চমৎকারভাবে। একটি কবিতায় গৃহ-লক্ষ্মীর মৃত্যুর শিকার হওয়া প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

সন্ধ্যা-বউ গলায় ধোঁয়ার ফাঁস বেঁধে ঝুলে পড়ে
ধূমল শাড়ির প্রান্ত দপ্ করে জ্বলে ওঠে গ্যাসের ওপরে
বীভৎস করুণ মৃত্যু আনে।

কালো সাপের প্রতীকেও কলকাতার রূপ বর্ণিত হয়েছে তাঁর 'কলকাতা' কবিতায়—

কলকাতা কালো সাপ লেজ যার লেকে,
ফনা যার হাওয়ার পোলে :
মাঝ রাতে দেখি তার মাথার উপর
পূর্ণিমা চাঁদ জ্বলজ্বলে।

এবার কবি সমর সেনের কথা। তাঁর কবিতায় মূলতঃ যুগজীবনের অবস্থাই প্রতিফলিত। তাঁর 'নাগরিক' কবিতায় বর্ণিত হয়েছে এই মহানগরী কলকাতার এক বিবর্ণ চিত্র। আবার কোথাও বা কবি ব্যক্ত করেছেন কলকাতা শহরের সেই তাণ্ডব লীলাকে যেখানে নারীর নারীত্ব বিক্রি হয়ে যায় মাত্র দশ টাকার বিনিময়ে—

হে শহর হে ধূসর শহর!
লুব্ধ লোকের ভিড়ে যখন তুমি নাচো
দশ টাকায় কেনা কয়েক প্রহরের হে উর্বশী,
তখন শাড়ির আর তাড়ির উল্লাসে,
অমৃতের পুত্রের বুকে চিত্ত আত্মহারা
নাচে রক্ত ধারা।

তাই কলকাতার কাছে কবির একান্ত আবেদন ঝরে পড়েছে তাঁর 'নাগরিক' কবিতায়—

ভস্ম অপমান শয্যা ছাড়ো
হে মহানগরী।

এই কলকাতা মহানগরীর কথা এসেছে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাতেও। তিনিও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে বিচার করতে তৎপর হয়েছেন। আরো বলা চলে, নতুন যুগের সংশয়, সন্দেহ, বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ তাঁর কলকাতা কেন্দ্রিক কবিতাগুলিতে ত বটেই তদুপরি তাঁর সমগ্র কাব্য সাধনার ইতিহাসেও অত্যন্ত সত্য। তাঁর 'ঊনত্রিশে জুলাই' শীর্ষক কবিতায় আছে—

স্ট্রাইক। স্ট্রাইক। বিজলীর চোখ গেলে দাও
করো চৌরঙ্গীকে অন্ধ।
স্ট্রাইক। স্ট্রাইক। ডাক আর তার ভাই। টেলিফোন-বোন,
ভয় নেই পাশে আমরা

* * * * * * * * *

স্ট্রাইক। স্ট্রাইক। শারদাকে করব কালাপানি পার
তবে যুদ্ধের শাস্তি

'সালেমানের মা' কবিতাতেও বর্ণিত হয়েছে—

এ' কলকাতা শহরে
অলিগলির গোলক ধাঁধায়
কোথায় লুকিয়ে তুমি, সালেমানের মা ?

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও সমাজমনস্ক ও সমাজের প্রতি অতিমাত্রায় দায়বদ্ধ একজন শিল্পি। তবে তাঁর সেই অতিমাত্রিক সমাজ-মনস্কতা অনেক সময়ে তাঁকে এমন একটি পর্যায়ে নিয়ে গেছে, যেখানে তিনি হয়ে পড়েন একজন রাজনৈতিক কবিও বটে। তাঁর প্রিয় বিষয়ই হল স্বদেশ ও ক্ষুধা। এই ক্ষুধার অতৃপ্তি নিয়েই মানুষের মৃত্যুর কথা বর্ণিত হয়েছে তাঁর 'তুমি কি ফোটাবে আফিমের ফুল, কলকাতা' কবিতায়—

আমরা জেগে ঘুমিয়ে ছিলাম, কলকাতা। এখন
এইমাত্র জানি, তারা কেউ ফেরে নি ; শুধুই ভেসে
আসে হরিধ্বনি, বহুদূর থেকে।

আসলে আজব শহর কলকাতাকে তিনি অনেকটা 'গলিত কুষ্ঠের ভীড়ে মৃত্যুগামী পান্ডুর আকাশের মতই বিবর্ণ' বলে মনে করেন। যদিও তা কলকাতা প্রীতিরই অন্যতর দিক মাত্র। তাই কলকাতার বুকে নিত্যই ঘটে চলা পরিতৃপ্ত স্বর্ণলোভী অথবা তারই পাশাপাশি এক নির্ভীক যুবকের মরণজয়ী চিত্তকে অতি সাদামাটা ভাষায় উপস্থাপিত হতে দেখি তাঁর কলকাতা-কেন্দ্রিক একটি কবিতায়। কবিতাটির প্রথম পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে—

তিলে তিলে নগরীর সুন্দর ও স্বাস্থ্যর হত্যায়
পরিতৃপ্ত স্বর্ণলোভী প্রত্যহের ডালহাউসী স্কোয়ার।

তারপর—

সে এক তরুণ
নির্ভীক মরণজয়ী! এসেছে সে পদাতিক ভিড়ে
কলকাতায় প্রাসাদ ও কুঁড়েঘর, ফুটপাত হতে;
স্বর্ণায়ু ব্যাধির দিন সুস্থ হতে ফেলে দেবে ছিঁড়ে।

এখানকার গঙ্গানদী সম্পর্কেও কবির বক্তব্য "গঙ্গানদী প্রবাহিত; প্রবাহিত চিতা, শবদেহ"। তাঁর 'ট্যাক্স' কবিতাতেও বর্ণিত হয়েছে কলকাতার শোষক ও শোষিত শ্রেণীর কথা—

তাদের ওপর নতুন করে ট্যাক্স বসে
ওরা দূরে থেকে দ্যাখে আর হাসে
এরা তখন কার্লমার্কসের নতুন স্ট্যাচু কোথায় বসাবে
তাই নিয়ে রাস্তা খোঁজে।

তথাপি কবি আশাবাদী। তিনি স্বপ্ন দেখেন লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্ম-বলিদানে কলকাতারই বুকে নেমে আসবে একদিন সম্ভাবী অমৃত।

এবার কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কথা। তাঁর 'কবিতা' নামক কবিতায় বর্ণিত হয়েছে কলকাতারই বুকে নেমে আসা এক রাত্রির বিবরণ। কিন্তু সে রাত্রি জীবনানন্দের 'রাত্রি'র মতোন কোন প্রতীকী ব্যঞ্জনা আনে না, বরং রাত্রির অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটিকেই তা দ্যোতিত করে মাত্র। এই কলকাতাকে ঘিরে কবির নানা স্বপ্নও ভাষা পেয়েছে তাঁর 'পাগলা ঘণ্টি' কবিতায়। কবিতাটিতে কবি তাঁর অন্তরতম মানুষটিকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন এই কলকাতারই বুকে—

আমি তাকে ডাকি,
বলি, চলো, কলকাতায় যাই,
পাতাল-রেলের জন্যে মাটি খুঁড়ি, সুড়ঙ্গ বানাই,
রাস্তা করি চওড়া, তাতে ছাড়ি
আরও পাঁচশ বাঘমার্কা দোতলা হাওড়া গাড়ি,
পরিচ্ছন্ন করে তুলি মানিকতলার খাল,
হটাই জঞ্জাল—।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে কবি শঙ্খ ঘোষের কথাও। কারণ বিশিষ্ট মানসিকতার আধার রূপে কলকাতা তাঁর কবিতাতেও চিত্রিত হয়েছে সার্থকভাবে। আবার কখনও বা বিভিন্ন চিত্রকল্পের মাধ্যমেও কলকাতার সামাজিক প্রেক্ষাপটকে বিস্তারিত হতে দেখেছি তাঁর কলকাতা কেন্দ্রিক কবিতাগুলিতে। তিনি বিশ্বাস

করেন সমাজ অবশ্যই একদিন যথার্থ পথে চালিত হবে কিন্তু তা কেবল আত্ম-বলিদানের মাধ্যমেই। 'সর্বনাশের গাথা' কবিতাতেও কবি শঙ্খ ঘোষ তুলে ধরেছেন কলকাতার একটি অতি পরিচিত বাস্তব খণ্ডাংশকে। কলকাতাকে 'বাহারে' সম্বোধনে বিশেষিত করে তিনি বলেছেন—

মাতছিল এই শহর যখন
ম্যাজিকে আর সার্কাসে
মানুষ নিয়ে মানুষ যখন
বানিয়ে তোলে কাবাব
গারদ থেকে সরিয়ে নিয়ে
পিঠে বসায় থাবা
অমনি সবার কলজে ফাটে
ফাটে সবার মাথা
আহারে কলকাতা বাহা
বাহারে কলকাতা।

কলকাতার বাস্তব অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে একটি ভিখারীর চিত্রও তিনি অঙ্কন করেছেন বেশ সহানুভূতির সঙ্গেই। তাঁর 'মধ্যদুপুর,' কবিতাতেই আছে—

সি. আই. রোডের ওপর পাথরকুচির উপর
হাত ছড়িয়ে দিয়ে
ঘুমিয়ে আছে আমার মেয়ে
বুকের কাছে এনামেলের বাটি।

আবার গ্রামের মানুষের চোখে কলকাতা কেমন, সে পরিচয় আছে তাঁর 'কলকাতা' কবিতায়। কবিতাটিতে বর্ণিত হয়েছে গ্রামের এক যুবক গিয়েছিল কলকাতা দেখতে। কিন্তু বেচারী কলকাতার চালচলন দেখে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। তার চোখে কলকাতার সবই দুষ্ট। এমনকি কলকাতার লোকের মুখ, তাও নাকি শ্যাওলায় আচ্ছন্ন। গ্রামের যুবকের কাছে কলকাতার এই তিক্ত অভিজ্ঞতার কথাই বর্ণিত হয়েছে কবিতাটিতে—

বাপজান হে
কইলকাত্তায় গিয়া দেখি সক্কলেই সব জানে
আমিই কিছু জানি না।

আমারে কেউ পুছত না
কইলকাত্তার পথে ঘাটে অন্য সবাই দুষ্ট বটে
নিজে তো কেউ দুষ্ট না

কইলকাতার রঙ্গে
যার দিকে চাই তারই মুখে আদ্যিকালের মজা পুকুর
শ্যাওলা পচা ভাসে

অতএব সোনা বৌ আমিনার কাছে শেষ পর্যন্ত আর সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয় এই বলে—

অ সোনাবউ আমিনা
আমারে তুই বাইন্দা রাখিস, জীবন ভইরা আমি-তো আর
কইলকাতায় যামু না।

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতাতেও কলকাতার কথা এসেছে। তবে পূর্ববর্তী কবিদের মত অত বিস্তৃততর ক্ষেত্রে অথবা প্রতীকী ব্যঞ্জনার গভীরতার অর্থে তা প্রযুক্ত হয়নি, নেহাৎই সাম্যবাদী জীবন দর্শনের কথা বলতে গিয়ে কলকাতা সেখানে ব্যবহৃত হয়েছে একটি প্রেক্ষাপট রূপেই। তাঁর 'সেপ্টেম্বর ৪৬' নামক কবিতায় আছে—

জুলাই। জুলাই। আবার আসুক ফিরে
আজকের কলকাতায় এ প্রার্থনা ;
দিকে দিকে শুধু মিছিলের কোলাহল—
এখনো প্রায়ের শব্দ যাচ্ছে শোনা।

কবিতার অন্যত্রও আছে, রক্তের কলঙ্কে এ শহর প্রতিনিয়তই আমাদের কাছে ভয়ের উদ্রেক করে। বিশেষতঃ সন্ধ্যে হলে ত কোন কথাই নেই। স্বজাতি স্বজাতিকে আক্রমণ করতেই এখানে সদাব্যস্ত। সন্ধ্যায় ট্রামও নেই, বাসও নেই। অই সুকলেই ভাবে কখন সকাল হবে, হবে সেই দিনের মত সব আতঙ্কের অবসান। তাই কলকাতার কোন রোমান্টিক চিত্রকে আমরা বড় একটা পাই না বরং সবেতেই একটা বিদ্রোহের আগুন তার দর্পিত শিখা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতায়। তাঁর 'মুক্তবীরদের প্রতি' কবিতাতেও আছে তখনকার ও এখনকার কলকাতার একটি তুলনামূলক চিত্র। কবির ভাষায়—

পার্কের মোড়ে, ঘরে, ময়দানে, মাঠে
মুক্তির দাবী করেছি তীব্রতর,
সারা কলকাতা শ্লোগানেই থরো থরো।
এই সেই কলকাতা।
একদিন যার ভয়ে দুরুদুরু বৃটিশ নোয়াত মাথা
মনে পড়ে চাব্বশে ?
সেদিন দুপুরে সারা কলকাতা হারিয়ে ফেলেছে দিশে ;

*   *   *   *

জানি বিকৃত আজকের কলকাতা
বৃটিশ এখন এখানে জনত্রাতা।

কবি পূর্ণেন্দু পত্রীরও কলকাতা কেন্দ্রিক কবিতার সংখ্যা অসংখ্য। যেমন তাঁর একটি কবিতায় বর্ণিত হয়েছে রোগগ্রস্ত কলকাতার কথা—

তবে কলকাতার এ'খন ডায়াবিটিশ
কলকাতার ইউরিণে এখন বিরানব্বই পার্সেণ্ট সুগার।
কলকাতার গলব্লাডারে ডাঁই ডাঁই পাথর।
গাছপালা খেয়ে আগের মতো হজম করতে পারে না বলে
কলকাতা এখন মানুষ খায়।

আবার কলকাতা যে এখন বৃক্ষহীন, মানুষ যে এখন গাছপালা কেটে প্রাসাদোপম অট্টালিকা তৈরীতেই সদা ব্যস্ত সেকথাও বর্ণিত হয়েছে তাঁর 'ডাক্তারবাবু আমার চশমাটা' কবিতায়। কবি লিখেছেন—

কলকাতায় গাছ নেই।
কলকাতার মহীরুহরা মরে গেছে সেই বাপ-ঠাকুদ্দার আমলে।

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর একাধিক কবিতায় কলকাতাকে চিত্রিত করেছেন। তিনিও কলকাতা প্রেমিক ও সমাজসচেতন। তাঁর কবিতা গড়ে ওঠে নিসর্গের বুকে আশ্রয় কামনায়, নির্মম আত্মানুসন্ধানে, স্বরচিত বিষাদে আত্ম বিশ্লেষণে কিংবা আপনার ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে বারবার বিপর্যস্ত করার এক অনিঃশেষ ভাবনায়। তবে সব মিলিয়ে যেন এক নৈরাশ্য পীড়িত মনোভাবই কবিকে বারবার আকর্ষণ করে তাঁর কলকাতা বিষয়ক একাধিক কবিতায়। তাঁর 'দুঃখ' কবিতায় আছে—

আমি জানি দুঃখ পায়, কেঁদে হয় কলকাতা আকুল
মনের ভিতরে, তুমি একবার কান পেতে শোনো
মধ্য রাত্রে ফাঁকা রাস্তা, কান পাতো রাস্তার উপরে—
শুনবে কে যেন কাঁদছে, মনে মনে দুঃখের নিঃশ্বাস
পড়ছে—।

তথাপি কলকাতার যে এক অমোঘ আকর্ষণ আছে সেসত্যও কি অস্বীকার করা যায়? কর্ণের কবচকুণ্ডলের মতই যে তার অস্তিত্ব আমাদের প্রাণের সঙ্গে জড়িত। তাই জঙ্গলে হারিয়ে গিয়েও—

তুমি দেখবে, কলকাতা তোমার
চতুর্দিকে রয়ে গেছে শাল শিশু খয়ের গাছের
মতন নিবিড় হয়ে, তার কাছে পরিত্রাণ নেই—

কেন নেই তার কারণটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলা যায়—

কলকাতা তুমি রক্তের গভীরে রাখো জ্বালা
কলকাতা তুমি নতুন বোয়ের দুহাত জড়ানো মালা।

কিন্তু আপাত অর্থে কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কলকাতা প্রীতি এতটা অন্ধভক্তির দাস নয়। তাই মাঝে মাঝেই তাতে প্রকাশ পেয়েছে রাগী কলকাতার চিত্র। তাঁর 'আমি ও কলকাতা' নামক কবিতায় আছে—

কলকাতা আমার বুকে বিষম পাথর হয়ে আছে
আমি এর সর্বনাশ করে যাব—
*　　*　　*　　*
কলকাতা, আমার হাত ছাড়িয়ে কোথায় যাবে, তুমি
কিছুতেই ক্যানিং স্ট্রীটে লুকোতে পারবে না—
চীনে পাড়া-ভাঙ্গা রাস্তা দিয়ে ছুটলে বাঘের মতো
　　　　　　　　চৌরঙ্গি পেরিয়ে
আমার অনুসরণ।

কবি নবনীতা দেবসেনের কলকাতার কাছে আবেদন, "এবার আমাকে গ্রহণ কর কলকাতা।" অথবা অন্যত্র "আমিই তোমার সেই চির আকাঙ্ক্ষিতা / বাল্য-সখী পুরাতনী শিখা।" এপ্রেম একমাত্র জীবনানন্দের সঙ্গেই তুলনীয়, যদিও অনেক কবিরই স্বপ্ন মিলিত হয়েছে ঐ জীবনানন্দেই—প্রকাশিত ভাববক্তব্যে যতই না কেন একের সঙ্গে অন্যের বিস্তর পার্থক্যই থাকুক—

এই পৃথিবীর রণরক্ত সফলতা
সত্য, তবু শেষ সত্য নয়
কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে।

যদিও কবি জয় গোস্বামী লিখছেন, তাঁর 'জিভ' কবিতায়—

বাবুদের ভাঙ্গা গ্যারেজে আহার
করা শেষ হল না—ফোটা
একটি কুড়িকে, ক্ষুর নে
ওলো কুঁড়ি তুই! লুব্ধ পাখিরা
তোকে ছিঁড়ে খেল যে সভার
ভিতরে, যে খলে, গ্রানিটে
তোকে পিষে নিল কলকাতা পেলে কি জোয়ারজিনহো
নিয়ে মেতে আছে। ওলে কুঁড়ি তুই আরো দে।

বাংলা ছোটগল্পে শিক্ষক

শিক্ষক বলতেই আমাদের মনে পড়ে যায় শুধু তাঁদের কথা যাঁরা ছাত্র বৎসল ও বিরল আদর্শের প্রতিভূ। ঠিক যেমনটি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ, পরশুরাম তারাশঙ্কর প্রমুখেরা তাঁদের সাহিত্যে। তাঁদের অসংখ্য ছোটগল্পেই দেখি শিক্ষকেরা বিশেষ কোন স্বার্থবোধের দ্বারা চালিত নন, বরং রবীন্দ্রনাথের 'মাস্টার মশাই' গল্পের হরলালের মতই তাঁরা ছাত্রদের জীবন নিয়েই কেবল চিন্তিত। অবশ্য মাঝে মাঝে যে আমাদের শিক্ষক সম্পর্কিত মানসিকতার বিপরীতে তাঁদের চরিত্র চিত্রিত হয়নি তা নয়, তবু তাঁরা একটি আদর্শের বাতাবরণেই যেন রয়ে গেছেন। অর্থাৎ শিক্ষক সেখানে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেননি। কিন্তু মানিক-সাহিত্যে এরই বিপরীত চিত্র লক্ষ্য করার মত। সেখানে শিক্ষক কেবল ছাত্রদের জন্যই নয় নিজের আর্থিক অভাব অনটনের জন্যেও সদা চিন্তিত। তাঁর 'টিচার' গল্পেই দেখা যায় মাইনে বাড়াবার জন্য গিরিনবাবুরা ধর্মঘট করেছেন। অর্থাৎ যুগের পরিবর্তনে আমাদের ট্র্যাডিশন্‌ও যে কিভাবে বদলে যেতে বসছিল, শিক্ষকও ক্রমে ক্রমে ব্যক্তি হয়ে উঠছিলেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'টিচার' গল্পটি তারই সাক্ষ্য বহন করছে। অবশ্য উত্তরকালের লেখকেরা যে সকলেই এই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন তা বলা যায় না, তবু যুগের পরিবর্তনে শিক্ষকের চরিত্র সেখানে অনেক বেশী জটিল হয়ে উঠেছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আমরা আমাদের আলোচনার জন্য রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সমরেশ বসু পর্যন্ত কয়েকজন বিশিষ্ট গল্পকারকেই বেছে নিয়েছি এক্ষেত্রে।

আমাদের আলোচনার শুরুতেই রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসংখ্য ছোট গল্পেই এই শিক্ষক মশাইয়ের চরিত্রটিকে এঁকেছেন বেশ দক্ষতার সঙ্গেই। কিন্তু তাঁর সকল ছোটগল্পেই যে শিক্ষকের ভাগ্যে তাঁদের উপযুক্ত সম্মান জুটেছে তা নয়। 'ছুটি' গল্পেই দেখি ফটিকের স্কুল শিক্ষক তাঁর দরদহীন আচরণের জন্যই রবীন্দ্রনাথের ভ্রূকুটিতে পড়েছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "একদিন ফটিক তাহার স্কুলের বই হারাইয়া ফেলিল। একে তো সহজেই পড়া তৈরী হয় না তাহার পর বই হারাইয়া একেবারে নাচার হইয়া পড়িল। মাস্টার প্রতিদিন তাহাকে অত্যন্ত মারধোর অপমান করিতে আরম্ভ করিলেন।"

স্কুল মাস্টারের প্রসঙ্গটি 'মণিহারা' গল্পেও বিদ্যমান। তাঁকে দেখে ইংরেজ কবি কোলরিজের সৃষ্ট প্রাচীন নাবিকের কথাই যেন বারবার মনে উদয় হয়। রবীন্দ্রনাথের কলমে এর বর্ণনা আরো তীব্র, "সেই অন্ধকার সভাভূমিতে কৌতুকপ্রিয় শৃগাল সম্প্রদায় ইস্কুল মাস্টারের ব্যাখ্যাত দাম্পত্যনীতি শুনিয়াই হউক বা নবসভ্যতা দুর্বল ফণীভূষণের আচরণেই হউক, রহিয়া রহিয়া অট্টহাস্য

করিয়া উঠিতে লাগিল। তাহাদের ভাবোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত হইয়া জলস্থল দ্বিগুণতর নিস্তব্ধ হইলে পর মাস্টার সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁহার বৃহৎ উজ্জ্বল চক্ষু পাকাইয়া গল্প করিতে লাগিলেন।"

কিন্তু এর বিপরীত চিত্রও দুর্লভ নয়। কারণ এমন অনেক ছোটগল্পই আছে যেখানে তিনি শিক্ষককে তাঁর প্রাপ্য সম্মানই দিয়েছেন। তাঁদের প্রতি প্রকাশ করেছেন তাঁর অন্তরের অন্তহীন শ্রদ্ধাকে। এমনই একটি ছোটগল্প হল তাঁর 'মাস্টারমশাই।' গল্পে দেখা যায় বেণুগোপালকে পড়াবার জন্যেই তিনি গৃহশিক্ষক রূপে নিযুক্ত হয়েছেন অধরবাবুর বাড়ীতে। আদর্শ শিক্ষকের মতো বেণুগোপালের মনও তিনি জয় করেছেন প্রকৃত ভালবাসা দিয়ে। বেণুও তাঁকে ভালবাসতে শুরু করেছে একটু একটু করে। ক্রমে বেণুর সঙ্গে খেলা করে, তাকে পড়িয়ে, অসুখের সময়ে তার সেবা করে হরলাল স্পষ্টই বুঝতে পেরেছেন, নিজের অবস্থার উন্নতি করার চেয়ে মানুষের আর একটা জিনিস আছে, সে যখন মানুষকে পেয়ে বসে তখন তার কাছে আর কিছুই লাগে না। সে হল ভালবাসা। হরলালবাবু বেণুকে ভালই বেসেছিলেন। কিন্তু তার বাড়ীর লোক এ ভালবাসা বুঝল না। বাড়ীতে চুরির অজুহাত দেখিয়ে হরলালকে তারা বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিল। বেণুও স্কুল থেকে এসে দেখল তার মাস্টার-মশাইয়ের ঘর শূন্য। পরদিন তাই সে নিজেই দারোয়ানকে নিয়ে গিয়ে সোজা হাজির হল মাস্টার মশাইয়ের বাড়ীতে। তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে সে অনুরোধ করল, "মাস্টারমশাই আমাদের বাড়ী চল।" কিন্তু কেন যে বেণুদের বাড়ী যাওয়া হরলালের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব সেকথা বলতে গিয়েও তিনি বলতে পারলেন না। কারণ সর্বতোভদ্র হরলালেরই তাতে ভদ্রতার অন্যথা হবে। এখানেই তাঁর ট্রাজেডি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মমত্ব তাঁর ওপর আরো অর্পিত হয়েছে তখনই যখন তাঁর বাড়ী থেকে তিন হাজার টাকা বেণুগোপাল চুরি করে নিয়ে গেলেও হরলাল সেকথা গোপন রেখে সকলের কাছে নিজেকে অপরাধী সাজিয়েছেন। কারণ সাহেবের হাজার মিনতিতেও তিনি স্বীকার করেননি যে তাঁর ছাত্রই আসলে সেই টাকা চুরি করে পালিয়েছে। আর এখানেই ছাত্র বৎসল রূপে হরলালের চরিত্রটি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় রবীন্দ্রনাথ কেনই বা এই দুই বিপরীত শ্রেণীর শিক্ষক চরিত্রের অবতারণা করলেন তাঁর ছোটগল্পে। কারণ রবীন্দ্রনাথ যাঁদের আদর্শ শিক্ষক বলে ভাবতেন তাঁদের একটি ভাবমূর্তি যেমন তাঁর অন্তরে ছিল তেমনই ছিল তাঁর বাল্যজীবনের দুঃখময় স্মৃতিকাহিনী। কবি তাঁর রচনায় লিখেছেন, "শিক্ষকদের মধ্যে একজনের কথা আমার মনে আছে, তিনি এমন কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করিতেন যে, তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধাবশতঃ তাঁহার কোন প্রশ্নেরই উত্তর করিতাম না।"

অবশ্য শিক্ষক সম্পর্কে এরূপ আপাত কটূ মন্তব্য তিনি আরও অনেক জায়গাতেই করেছেন। কারণ তিনি মনে করতেন যে ছাত্র যদি শিক্ষককে ভয় পায় তাহলে ছাত্রদের ভার নেবার পক্ষে তিনি অযোগ্য। যিনি জাত শিক্ষক, ছেলেদের ডাক পেলেই তাঁর ভেতরের আদিম ছেলেটা আপনিই ছুটে আসে। ছেলেরা যদি তাঁদের সমশ্রেণীর জীব বলে ভাবতে না পারে, যদি মনে করে লোকটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন প্রাণী তাহলে কখনই তারা হাত বাড়িয়ে দেবে না।

তাঁর 'গিন্নি' গল্পের শিবনাথ পণ্ডিত হলেন এমনই এক শিক্ষক। তাঁর চুল দাড়ি কামানো। টিকি হ্রস্ব। তাঁকে দেখলেই ছেলেদের অন্তরাত্মা শুকিয়ে যেত। এর ওপর তাঁর কিল-চড়-চাপড় যখন ছাত্রদের ওপর বর্ষিত হত তখন অপর দিকে তাঁর শ্লেষ বাক্যবাণের জ্বালাতেও সকলের প্রাণ রক্ষা করাই দায় হয়ে উঠত। বালকদের পীড়ন করবার জন্য শিবনাথ পণ্ডিতের আরও একটি অস্ত্র ছিল। সেটি শুনতে যৎসামান্য কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অতিশয় নিদারুণ। তিনি ছেলেদের নতুন নামকরণ করতেন। একটি ছেলের তিনি নামকরণ করেছিলেন 'গিন্নি'। তাই নিয়েই এই গল্পটি।

এইবার আমরা রবীন্দ্র-সমসাময়িক প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের নাম করতে পারি। কিন্তু দুএকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে তাঁর গল্প প্রায়ই জনরঞ্জক ও বহির্মুখী। গল্পের চরিত্রগুলির মধ্যেও তেমন কোন "প্রতীকী সত্যের সামগ্রিক উন্মীলন" দেখতে পাওয়া যায় না। তাঁর 'যুবকের প্রেম' গল্পে চিত্রিত মহেন্দ্রর চরিত্রটি হল এমনই একটি চরিত্র। সে ছাত্র জীবনে পড়াশোনায় তেমন একটা ভাল ছিল না বরং পড়াশোনার চাইতে পাশা খেলা, ক্রিকেট, ফুটবল, জিমন্যাস্টিক প্রভৃতিতেই ছিল বেশি পোক্ত। তথাপি একটা জিনিস সে বেশ আয়ত্ত করেছিল তা হল ইংরেজী ভাষা ও তার আদব-কায়দা। ঘটনাচক্রে কলকাতায় এসে মেজর সাহেবের স্ত্রীকে সে বাংলাও পড়াতে লাগল। কিন্তু পড়াতে গিয়ে পরস্পর পরস্পরের প্রতি ক্রমে আসক্তই হয়ে উঠল। অর্থাৎ যে মহেন্দ্র তার পত্নী বিয়োগের পর প্রতিজ্ঞা করেছিল, জীবনে আর কখনো বিবাহ করবে না, সেই শেষে পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরস্ত্রীতে আসক্ত হয়ে বসল। অর্থাৎ প্রতিকূল পরিবেশে মানুষ যে কতখানি দুর্বল ও অসহায় হয়ে পড়ে মহেন্দ্র তারই সাক্ষ্য বহন করছে। অবশ্য পরে সে নিজেকেই নিজে ধিক্কার দিয়েছে এই বলে, "এ আমি কী করিলাম। আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আজীবন আমার মৃতা পত্নীর পবিত্র স্মৃতি বুকে করিয়া ভালবাসায় তন্ময় হইয়া থাকিব···একনিষ্ঠ পত্নীপ্রেমের দৃষ্টান্ত জগৎকে দেখাইব—সে প্রতিজ্ঞা আমার কোথায় রহিল? ছি ছি—আমি কী নীচ! কী দুর্বল! কী অপদার্থ! আমি তো মনুষ্য নামের অযোগ্য। আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।"

কিন্তু মহেন্দ্রের এই আত্মধিক্কার যে মন থেকে নির্গত হয়নি, নিছকই ভাবুক প্রকৃতির মহেন্দ্রর তা ছিল একটি সাময়িক উচ্ছ্বাস মাত্র তার প্রমাণ পাই গল্পের পরবর্তী পদক্ষেপেই। দেখি মহেন্দ্র ও মেজরের স্ত্রী এলসি ক্রমেই ডুবে যেতে থাকল পরস্পর পরস্পরের নেশায়। ঘটনাচক্রে তা পাঁচকান হয়ে গেলে মেজর গ্রীণ তাকে হত্যা করারও চেষ্টা করেন। কিন্তু ভাগ্যবলে বেঁচে যায় মহেন্দ্র এবং শেষে সে প্রত্যাবর্তন করে তার গ্রামের বাড়ীতে। লক্ষ্য করার বিষয় রবীন্দ্র-সমসাময়িক হয়েও শিক্ষক চরিত্রটি চিত্রণের ব্যাপারে প্রভাতকুমার যে স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন তা অনেকটা কল্লোলের বাঁক ফেরার মত। ঠিক এমনই একটি শিক্ষকের সন্ধান পাওয়া গেছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে। তাঁর সেই গল্পের নাম 'বিড়ম্বনা'।

এরপর শরৎচন্দ্রের কথা। তাঁর গল্পে শিক্ষকের চরিত্রটি তেমন ভাবে না এলেও 'লালু' গল্পে বর্ণিত হয়েছে এক নিরীহ গোছের মানুষ বিষ্টু পণ্ডিতের কথা। পণ্ডিত মশাই নিজে ছিলেন চিররুগ্ন এবং আজীবন স্ত্রীর প্রতিই একান্তভাবে নির্ভরশীল। জগতে তাঁর আপনার বলতে কেউই ছিল না। তাঁর মত নিরীহ লোক বিশ্বসংসারে সত্যিই দুর্লভ।

কিন্তু হঠাৎ করে তারই একদিন বিপদ ঘনিয়ে এল। যে স্ত্রীর প্রতি তিনি ছিলেন একান্তভাবেই নির্ভরশীল সেই স্ত্রীই একদিন মারা গেলেন। গ্রামের সকলে মিলে পণ্ডিত গৃহিণীকে নিয়ে যাবার তোড়জোড় করতে শুরু করলেন। পন্ডিত মশাই শুধু ফ্যালফ্যাল করে সেদিকে চেয়ে রইলেন। সংসারের কোন কিছুর সঙ্গেই সে চাহনির তুলনা হয় না।

এয়োস্ত্রী মারা গেলে তার মাথায় স্বামীকে নিজের হাতে সিঁদুর পরিয়ে দিতে হয়। এইটিই সংস্কার। পণ্ডিত মশাইয়ের মনেও ছিল এই সংস্কার। তাই স্ত্রী মারা যাবার পর তাঁকে নিয়ে যাবার সময়ে তাঁর মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দেবার কথা তিনিও বিস্মৃত হননি।

এরপর ছোটগল্পের অন্যতম প্রাণপুরুষ পরশুরাম ওরফে রাজশেখর বসুর প্রসঙ্গ। তাঁর মহেশের মহাযাত্রা, একগুঁয়ে বার্থা, নীলতারা, তিলোত্তমা, আতার পায়েস প্রভৃতি অসংখ্য ছোটগল্পেই শিক্ষকের কথা বর্ণিত হয়েছে। 'আতার পায়েস' গল্পে আছে এক মজার মাস্টার মশাইয়ের কথা। 'মজা' অবশ্য রবীন্দ্রনাথেও ছিল কিন্তু শিক্ষক সেখানে এমন বন্ধুস্থানীয় হয়ে উঠতে পারেন নি। কিন্তু 'আতার পায়েসে'র শিক্ষক একেবারেই ছাত্রদের বন্ধু হয়ে উঠেছেন। শিক্ষকের নাম প্রবোধ। প্রবোধ বড় আমুদে লোক। ছাত্ররাও তাঁকে খুব ভালবাসে। একবার পুজোর ছুটির কয়েকদিন আগে কয়েকটি ছেলে তাঁকে ঘিরে ধরল তাদের নিয়ে বাইরে ঘুরে আসতে হবে। মাস্টার মশাই হবেন তাদের অভিভাবক।

অতএব প্রবোধও অভিভাবক সেজে বসলেন তাদের। একাজে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। যে বাড়ীতে তাঁরা উঠেছিলেন সে বাড়ীতে অনেক রকম ফলের গাছ। বলতে গেলে সারা জায়গাটিই ছিল গাছে গাছে ঘেরা। তাঁরা ঠিক করলেন আতা গাছ থেকে আতা পেড়ে আতার পায়েস রান্না করে তাঁরা খাবেন। বাড়ীর পাঁড়েও জানাল পায়েসের উপযুক্ত দুধ সেই জোগাড় করে দেবে।

অতএব নাওয়া খাওয়ার বিশ্রাম চুকে গেল। মনের আনন্দে তারা সকলেই আত্মহারা। বিকেল বেলার পথে বেরিয়ে দেখল একটি গাছে অসংখ্য পেয়ারা ঝুলছে। ছাত্ররা নাছোড়বান্দা—পেয়ারা পাড়বে। কিন্তু প্রবোধ যেহেতু শিক্ষক সেহেতু এই চৌর্যকার্যে তিনি কখনই সায় দিতে পারলেন না। ছাত্রদের তিনি লোভ সংবরণ করতে বললেন, যদিও তাঁরই মৌন সম্মতিতে ছাত্ররা পেয়ারা পাড়তে উদ্যত হয়েছিল। এই সারল্যই প্রবোধ চরিত্রের অলংকার।

এমন সময়ে বাড়ীর মালিককে আসতে দেখা গেল। প্রবোধের যথার্থ পরিচয় পেয়ে তিনি বললেন, বাঃ খাসা অভিভাবকটি পেয়েছে তাঁর ছাত্রেরা। খুব নীতিশিক্ষা হচ্ছে। আর এখানেই শিশুর মত সরল প্রবোধের যথার্থ পরিচয়টি উদ্ঘাটিত হয়েছে ছাত্রদের কাছে। বুঝিবা আমাদের কাছেও।

'মহেশের মহাযাত্রা' গল্পে পাই প্রফেসার মহেশ মিত্তিরের কথা। অঙ্কের প্রফেসার তিনি। অসাধারণ বিদ্যে। কিন্তু প্রচণ্ড নাস্তিক। ভগবান, আত্মা, পরলোক তিনি কিছুই মানেন না। খাদ্যাখাদ্যেরও তাঁর কোন বাছবিচার ছিল না। প্রায়ই বলতেন, শুয়োর না খেলে হিন্দুর উন্নতির কোন আশা নেই। ওটা বাদ দিয়ে কোন জাতিই বড় হতে পারে না। কিন্তু অনাচার তিনি যতই করুন তাঁর স্বভাবটা ছিল অকপট। পারতপক্ষে মিথ্যেকথা তিনি বলতেন না। তাঁর পরম বন্ধু ছিলেন হরিনাথ কুণ্ডু। তিনিও ঐ কলেজেরই প্রফেসার। ফিলোজফি পড়াতেন। হরিনাথ আর কিছু না মানুন ভূত মানতেন। তাছাড়া মহেশবাবু যেখানে ছিলেন অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, সেখানে হরিনাথ ছিলেন খুবই আমুদে লোক। কথায় কথায় ঠাট্টা করা তাঁর একটি বিশেষ অভ্যাস ছিল। একদিন কলেজে কোন কাজ ছিল না। অধ্যাপকেরা সকলে মিলে গল্প করছিলেন। কিন্তু গল্পের আরম্ভ যাই হোক না কেন তাকে ভূত আর ভগবানে নিয়ে যাওয়াটা মহেশ ও হরিনাথের স্বভাব। সেদিনও তাই ঘটেছিল। একদল মহেশের এবং অন্যদল হরিনাথের পক্ষে গিয়ে দাঁড়ালেন। হরিনাথ কথা দিলেন যে করেই হোক ভূতের অস্তিত্ব তিনি প্রমাণ করবেনই। এই বলে তিনি একটা প্ল্যান করে সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রদের ভূত সাজিয়ে মহেশবাবুকে ভয় দেখালেন। কিন্তু মহেশ সবই ধরতে পারলেন। তাঁদের বন্ধুত্বও গেল ভেঙে। এরপর মহেশ একদিন মারা গেলেন। তাঁর শব

যাত্রার সঙ্গী হলেন হরিনাথ। আর তখন থেকেই মহেশের আত্মা ঘুরে বেড়াতে লাগল তাঁর আশে পাশে। তবে মৃত্যুর আগে মহেশ হরিনাথকে ডেকে একটি ভাল কাজ করে গিয়েছিলেন, যা তাঁর ছাত্র বৎসলতারই পরিচয় প্রকারান্তরে। তিনি হরিনাথকে বলে গিয়েছিলেন "এই রইল আমার উইল, তোমাকেই অছি নিযুক্ত করছি। আমার পৈতৃক দশ হাজার টাকার কাগজ ইউভার্সিটিকে দান করেছি, তার সুদ থেকে প্রতি বছর একটা পুরস্কার দেওয়া হবে। যে ছাত্র ভূতের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লিখবে সে ঐ পুরস্কার পাবে।"

ছোটগল্পের আলোচনায় বলতে হয় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাও। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন শিক্ষক। তাঁর অসংখ্য ছোট গল্পেই তাই শিক্ষকের চরিত্রটি চিত্রিত হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। এমনকি 'অনুবর্ত্তন' নামে তাঁর একটি উপন্যাসই রয়েছে যা পুরোপুরি শিক্ষক জীবনকে কেন্দ্র করে লেখা। তবে একটি কথা। তাঁর সাহিত্যের সর্বত্রই শিক্ষক প্রধানতঃ আদর্শবান ও ছাত্রবৎসল রূপেই চিহ্নিত।

তাঁর 'বিধুমাস্টার' গল্পে পাওয়া যায় এমনই এক শিক্ষকের কথা। তাঁর পুরো নাম শ্রীবিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায়। ম্যাট্রিক পাশ। প্রাইভেট টিউটর রূপেই তিনি নিযুক্ত হয়েছেন শ্রীনাথ দাস লেনের একটি বাড়ীতে। কথা হল বাড়ীর মোট পাঁচটি ছেলেমেয়ের পড়ানোর দায়িত্ব তাঁকে নিতে হবে।

বিধুমাস্টার মশাই ছাত্রবৎসল শিক্ষক রূপেই গল্পে চিত্রিত। তাই পড়াতে গিয়ে ছাত্রদেরও তিনি বড় ভালবেসে ফেললেন। প্রায়ই তাদের ফেরিওয়ালার কাছ থেকে বিভিন্ন রকম খাবার জিনিস কিনে খাওয়াতে লাগলেন। রেবার জন্মদিনে তিনটাকা দামের একটি রেল গাড়ীও তিনি কিনে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "কাউকে বলো না যেন ঘুণাক্ষরে"।

কিন্তু বড়ই দরিদ্র ছিলেন এই বিধু মাস্টার মশাই। তাঁর বাড়ীতে গিয়েও দেখা গেছে ঘর অপরিষ্কার। দেওয়ালে শুধু কতকগুলো ক্যালেন্ডার টাঙানো। একপাশে একখানা বিবেকানন্দের ছবি। কিন্তু তথাপি তিনি ছাত্রদের জন্য ঐ সব কিনে খাওয়াতেন। ভুলেও নিজের আর্থিক অবস্থার কথা ভাবতেন না। এব্যাপারে তাঁকে একদিন নিষেধ করা হলে তিনি সংকুচিত হন। কারণ আত্ম-মর্যাদা বোধ ছিল তাঁব খুবই প্রখর।

কিন্তু আসল ঘটনাটি ঘটেছিল অন্য জায়গায়। যিনি তাঁকে পড়ানোর জন্য বাড়ীতে নিযুক্ত করেছিলেন তিনিই একদিন মাস্টার মশাইকে বললেন, "এসব কি পড়াচ্ছেন মাস্টার মশাই? ইংরেজি আপনি দেখছি কিছুই জানেন না। 'I live in a boarding'—সেনটেন্সটার মধ্যে in কি এমন অপরাধ করেছে যে ওকে তুলে দিয়ে আপনি at বসিয়ে দিলেন?"

দেখা গেল নিরীহ প্রকৃতির মানুষ বিধুবাবু এর কোন প্রতিবাদ পর্যন্ত

করলেন না। বিনা প্রতিবাদেই বিদায় নিলেন তিনি। লেখক বর্ণনা করেছেন, "এর জন্য দোষী তো আমি। আমি তো মাস্টার মশাইয়ের ভুলগুলো মেজ কাকাকে বলে বলে তাঁর মন একেবারে চটিয়ে রেখেছিলুম।" এখানেই ট্রাজেডি।

কল্লোল ও কল্লোলেতর লেখকদের মধ্যে আমাদের আলোচনায় যাঁরা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট শিক্ষক চরিত্রের সঙ্গে তাঁর প্রধান পার্থক্যই হল এইখানে যে-রবীন্দ্রনাথ যেখানে শিক্ষক মানেই আদর্শ ও অযোগ্য দুই বিপরীত শ্রেণীর চরিত্রকে চিত্রিত করেছেন তাঁর সাহিত্যে, সেখানে তারাশঙ্কর কেবল আদর্শ শিক্ষকের কথাই বলেছেন তাঁর বিভিন্ন ছোটগল্পে। অবশ্য একই গল্পে বিপরীত শ্রেণীর চরিত্রের কথাও যে পাওয়া যায় না তা নয়, তবে তাঁরাই তারাশঙ্করের লক্ষ্য নন। মনে হয় ঐসব আদর্শ শিক্ষকের চরিত্র পরিস্ফুটনের জন্যই যেন এইসব চরিত্রের প্রয়োজন ছিল। আরো একটি কথা। তারাশঙ্করের অধিকাংশ ছোটগল্পেই দেখা যায় যে শিক্ষক সেখানে ধার্মিক ও দেবভক্ত। দেবতাদের প্রতি তাঁদের আস্থা অগাধ। তাঁরা পাঠশালায় যেমন পড়ান তেমনি বিভিন্ন গ্রামদেবতার পুজোও তাঁদের করতে হয়। জমিদার এলে কাউকে বা আবার পাচকের দায়িত্বও গ্রহণ করতে হয়। তাঁর 'হরিপন্ডিতের কাহিনী' গল্পের হরিপণ্ডিত হলেন ঠিক তেমনই একটি চরিত্র। আবার গৃহশিক্ষক কিংবা স্কুল শিক্ষক হিসেবে চন্দ্রভূষণ বা মধুবাবুর মতো চরিত্রও এঁকেছেন তিনি।

প্রথমে চন্দ্রভূষণ বাবুর কথা। 'হেডমাস্টার' গল্পের এই চন্দ্রভূষণ বাবু হলেন নবগ্রাম বিদ্যাপীঠের শিক্ষক। সারা জীবন ধরে তিনি এই বিদ্যালয়টির জন্য প্রাণপাত করেছেন। তিনি ছাত্রবৎসল আদর্শ শিক্ষক। ছাত্রদের শুধু ছাত্র হিসেবেই নয়, তাদের বাপ-মায়ের মতই মানুষ করে তুলতে চান তিনি। তারাশঙ্করের এই আদর্শের কথা অবশ্য তাঁর 'হেড পণ্ডিতের কাহিনী'তেও দেখতে পাওয়া যায়। হেড পণ্ডিতও ছাত্রদের পড়ান ঠিকই, কিন্তু ক্লাসে এলে সকলের দাঁত মাজা হয়েছে কিনা তাও তিনি জিজ্ঞাসা করেন। 'হেডমাস্টার' গল্পেও দেখা যায় হেডমাস্টার শুধু পড়ানোতেই তাঁদের দায়িত্ব শেষ করেন না। কোন ছাত্র অসুস্থ হলে তাকে তিনি দেখতেও যান। সকলকেই তিনি তাঁর মৃত পুত্র ব্রজকিশোর বলে ভাবেন। প্রথম যখন নবগ্রাম বিদ্যাপীঠ গড়ে তোলা হয়েছিল তখনও মাধব বাবুর কাছে তিনি সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত বসে থেকেছেন। তাঁকে টাকা খরচ করাতে রাজি করিয়েছেন। এখানকার সমাজ-পতিদের দোরে দোরে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মজুর খাটিয়েছেন। এই স্কুল তাঁর নিজের হাতে গড়া। ছাত্রেরাও তাঁর মুখের ওপর কোনদিন কথা বলেনি বরং কর্তব্যপরায়ণ, ছাত্রবৎসল ও ত্যাগী এই

মানুষটিকে সকলে শ্রদ্ধাই করে এসেছে আন্তরিক ভাবে।

কিন্তু সেই ছাত্ররাই সেদিন তাঁর মুখের ওপর প্রতিবাদ করল। রিলিজিয়াস ক্লাস তারা করবে না। অথচ এইটিই স্কুলের নিয়ম ছিল। শনিবার নিয়মিত ক্লাসের পর আধঘণ্টা ধর্মসভা। কিন্তু এর মূলেও কারণ ছিল। চন্দ্রভূষণ বাবুর ছেলে ব্রজকিশোর যখন মারা গিয়েছিল তখন বিশ্বসংসারের সব কিছুই অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল পিতা চন্দ্রভূষণের কাছে। তখন শান্তির সন্ধানের জন্য তিনি যান শান্তিনিকেতনের মহাকবির কাছে। মহাকবি পুত্রশোকাতুর প্রৌঢ়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন "আনন্দের ধ্যানেই তোমার শান্তি।" আর তখন থেকেই স্কুলে তিনি প্রবর্তন করেছিলেন এই ধর্মসভার। যা থেকে সৎ, আদর্শবান ও ধার্মিক ব্যক্তি রূপেই তিনি আমাদের সামনে উজ্জ্বলে হয়ে ওঠেন।

কিন্তু সেই ছাত্ররাই আজ বলছে, রিলিজিয়াস ক্লাস তারা করবে না। ঈশ্বর নেই। ধর্ম তারা মানে না। এই ট্রাজেডিই চন্দ্রভূষণ বাবুর চরিত্রের একটি বিরাট দিক। গভীর দুঃখের সঙ্গেই তাই তিনি ছাত্রদের বললেন, "ঊণপঞ্চাশ বছরের মধ্যে আজও পর্যন্ত ইস্কুলে কখনো কোন ছাত্র এইভাবে শিক্ষকের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করেনি। তোমরা প্রথম।"

এই উক্তির একদিকে যেমন চন্দ্রভূষণের গভীর অভিমান তেমনি অপরদিকে প্রবল আত্মমর্যাদা বোধই ক্রিয়াশীল হয়েছে। কিন্তু তিনি ছিলেন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ। তাই আগে ভাগেই তিনি অনুমান করে নিয়েছিলেন কি করবে তারা। তারা শিক্ষাবিভাগে দরখাস্ত করবে। তাই শেষ চেষ্টা করেও যখন তিনি তাঁর স্বপ্নকে সফল করে তুলতে পারলেন না, তখন 'রেজিগনেশন্ লেটার' দিয়ে তিনি চলে গেলেন। তখন স্কুলের জুবিলী চলছিল। কিন্তু চন্দ্রভূষণ বাবু আর আসেন নি। শুধু কাশী থেকে একটি চিঠিতে লিখে পাঠিয়েছিলেন, "যখন আমার চরণচিহ্ন পড়ে না আর এই ঘাটে, তখন নাই বা মনে রাখলে।" তখন বড় বেশী করে মনে পড়ে যায় ছাত্রবৎসল চন্দ্রভূষণের সেই গোপন স্বপ্নটির কথা, "ইস্কুলই সম্বল রইল পণ্ডিতমশাই। বুড়ো বয়সে খেতেও দেবে। দেবে না? অক্ষম হলেও আমাকে একটা পেনশন্ দেবে না? তা দেবে। ইস্কুলেই দেহ রাখব, ছেলেরাই সৎকার করবে, ওরাই শ্রাদ্ধ করবে। ওর কথা ছাড়া আর কোন কথা কইব?"

তারাশঙ্করের 'মধুমাস্টার', গল্পটির কথাও এ'প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মধুমাষ্টারের পুরো নাম শ্রী মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। তিনি সে' আমলের এম. এ. পাশ। বর্তমানে তিনি পাশের গ্রামের রায় বাহাদুরের এম. এল. হাই ইংলিশ স্কুলে ত্রিশ বৎসর ধরে থার্ড মাস্টারি করছেন। রায়বাড়ীর কর্তা জ্ঞানদাবাবুর ছেলেও তাঁর প্রাইভেট ছাত্র। মাস্টার মশাইয়ের স্বভাবটি এমনই

যে এই নিয়মিত কর্মটিতে তিনি কখনো অবহেলা করেন না। জল ঝড় শত শত দুর্যোগের মধ্যেও তিনি তাঁর বিবর্ণ ছাতাটি মাথায় করে হাজির হন ছাত্রের বাড়ীতে, যা থেকে তাঁর কতর্ব্যপরায়ণতার চিত্রটিই প্রকাশিত হয় আমাদের কাছে।

তাঁর ছিল ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। একবার জ্ঞানদাবাবুর ছেলেকে পড়াতে গিয়ে একটি বইতে সেই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিই কুট মন্তব্য প্রকাশিত হলে তিনি রেগে যান। বলেন, "বলে কি ইণ্ডিয়ান সিফিলাইজেশন, মানে—আমাদের সভ্যতার ইতিহাস সমস্ত মিথ্যে, রামায়ণ, মহাভারত মিথ্যে। মিশরের সভ্যতা নাকি সকলের আগে, তারই খানিকটা ভারতীয়রা নকল করেছিল মাত্র। নইলে তারা ছিল বর্বর অসভ্য।···আমি লিখব, এর বিরুদ্ধে আমি লিখব জ্ঞানদাবাবু।"

কিন্তু এই কথা বলেই তিনি তাঁর কর্তব্য শেষ করেন নি। প্রবল আত্মমর্যাদা বোধ সম্পন্ন মধুমাস্টার এই মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে একটি সত্যিকারের গ্রন্থ রচনায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তিনি শিক্ষক, তার ওপর "স্বদেশের মর্যাদা রক্ষায় আপোষহীন সংগ্রামী।" অতএব দারিদ্র্যই তাঁর জীবনের সম্বল হল। কারণ জ্ঞানদাবাবু প্রথমে তাঁকে অর্থ সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেও তিনি মারা গেলে তাঁর পুত্র অর্থাৎ মধুবাবুর ছাত্র তাতে সম্মত হতে পারেনি। বরং বাপের মৃত্যুর পর সে এই মন্তব্যই করেছে, "···বিলেতের ইংরেজের বইয়ের প্রতিবাদ লিখবেন শাঁখপুরের মধু মুখুজ্জে। আপনার লিখতে শখ হয় নিজে খরচ করে লিখুন গিয়ে।" এইখানেই মধু মাস্টারের ট্রাজেডি। কিন্তু তথাপি তিনি ভেঙে পড়েন নি। তাঁর মনের জোর ছিল ভীষণ। তাই জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে প্রবল পরিশ্রমেই তিনি রচনা করলেন তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই গ্রন্থটি। কিন্তু গ্রন্থটি যখন প্রকাশিত হল তখন মধুবাবু আর আমাদের মধ্যে নেই। দেখা গেল, কাগজে কাগজে তাঁর প্রশংসা বেরিয়েছে, হাজার পাঁচেক টাকাও পাওয়া গেছে বইয়ের দাম হিসেবে, কিন্তু মধুবাবু তার আগেই ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

'পণ্ডিতমহাশয়' গল্পেও চিত্রিত হয়েছে যতীন চাটুজ্জের কথা। লোকে তাঁকে বলে কাকপণ্ডিত। গলায় পৈতে আছে বলে বোঝা যায় ব্রাহ্মণ। তা ছাড়া ব্রাহ্মণহীন চাষীর গ্রামে গ্রামদেবতার পুজোও করেন তিনি। কিন্তু তার চরিত্রের বিশেষ দিকটি রয়েছে অন্যত্র। তিনি ছাত্রবৎসল, ছাত্রদের নিয়েই তাঁর যত ভাবনা চিন্তা। সেবছর একটি ছাত্রকে বৃত্তি পাওয়ানোয় তিনি যে কি ভাবে চৌর্যবৃত্তি গ্রহণ করে প্রকারান্তরে তাঁর ছাত্রবৎসলতারই পরিচয় দিয়েছিলেন তা নিয়েই এই গল্প। শেষে ধরা পড়ে গিয়ে তিনি নিজেই জমিদারের কাছে স্বীকার করেছেন, "হুজুর বড়ই মেধাবী ছাত্র এটি। কিন্তু সংসারে বড়ই

অভাব। ...তাই হুজুর আপনার দরবার হতে কিছু মসল্লা একে প্রদান করেছি। আর ঘৃতটাকে হুজুর, ঐ ওকেই সেবন করতে দিয়েছি—মেধাবী ছাত্র, ঘৃতে মেধা বৃদ্ধি হয়। হুজুর, ওকে এবার আমি বৃত্তি পরীক্ষা যেমন করে হোক দেওয়াব।"

এবার 'বনফুল' ওরফে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের কথা। তাঁর অনেকগুলি ছোটগল্পেই শিক্ষকের প্রসঙ্গ এসেছে। পরোক্ষভাবে এসেছে স্বাধীনতা, নেপথ্যে, উইল, কালো, দ্বিতীয় সাবিত্রী প্রভৃতি গল্পে। আর প্রত্যক্ষভাবে যেসব গল্পগুলির মধ্যে শিক্ষকের প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়েছে তার মধ্যে শ্রীনাথ পণ্ডিত, যোগেন পণ্ডিত, যোদ্ধা প্রভৃতি অন্যতম।

'যোগেন পণ্ডিত' গল্পে বর্ণিত হয়েছে পাঠশালার পণ্ডিত যোগেন পণ্ডিতের কথা। তিনি ছাত্রদের চড় চাপড় যেমন মারেন তেমনি ভালও বাসেন নিজের ছেলের মত। সকলেই তাঁকে ভয় করে। তাঁকে দেখলেই মনে পড়ে যায় প্রাচীনকালের গুরুমশাইরের কথা। ক্লাসে এসেই তিনি আদেশ দেন "ওরে, জল আন।" সঙ্গে সঙ্গে পাশের পুকুর থেকে ছাত্রেরা জল এনে দেয়। যোগেন পণ্ডিত পদ প্রক্ষালন করেন।

তিনি ছেলেদের মারতেন বটে কিন্তু ভালও বাসতেন ততোধিক। কতই বা মাইনে পেতেন, কিন্তু তা থেকেই ভাল ছেলেদের তিনি পুরস্কার দিতেন। গরীব ছেলেদের বই কিনে দিতেন। কারো অসুখ বিসুখ হলে তার খোঁজ নিতেন বাড়ীতে গিয়ে। দরকার হলে সেবাও করতেন। কেবল গুণ বা দোষ তাঁর একটাই। একালের হালচাল তিনি তেমন সহ্য করতে পারেন না। বেচাল হলেই কোন রকম আপোষ তিনি করেন না।

কিন্তু এহেন যোগেন পণ্ডিতেরই জীবনেই নেমে এল বিয়োগান্ত পরিণতি। যে ছাত্রদের তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করতেন, যাদের ভাবনাই তাঁকে একমাত্র ভাবিত করেছিল, সেই তারাই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বসল। যেদিন তিনি নতুন দারোগাবাবুর ছেলেকে গো-বেড়েন করলেন, সেদিন থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত হতে লাগল। দরখাস্ত পাঠিয়ে দেওয়া হল শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষের কাছে। যথানিয়মে ইন্সপেক্টরও এলেন। কিন্তু দেখা গেল অতবড় জাঁদরেল ইন্সপেক্টর ভূতনাথও তাঁকে দেখে কেমন যেন মিইয়ে গেলেন। পরে জানা গেল যে ঐ ভূতনাথই কোন এক সময়ে যোগেন পণ্ডিতের ছাত্র ছিল। পরে এই ভূতনাথের সঙ্গেই অবশ্য তিনি চলে গেলেন তাঁর বাড়ী। শুধু যাবার আগে একদৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে থাকলেন গ্রামটার দিকে।

'যোদ্ধা' গল্পেও বনফুল এই শিক্ষকের চরিত্রটি এঁকেছেন। কিন্তু কোন ক্রমেই তাঁকে আদর্শ শিক্ষক বলা যায় না। তাঁর নাম নরেন্দ্রনাথ। স্থানীয় স্কুলের কার্যকরী সভার সভ্য হিসেবেই তিনি নিবৃত্ত হয়েছিলেন। তিনি

প্রথম শ্রেণীর এম. এ, বি. টি। শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাও তাঁর আছে। তাঁর সার্টিফিকেট দেখে সকলেই সন্তুষ্ট। অতএব চাকরীও তাঁর পাকা হয়ে গেল।

লেখকও বর্ণনা করেছেন, বড় চৌকস ছোকরাটি। শুধু গুণবান নয় রূপবানও। গান, বাজনা খেলা সবেতেই তিনি পোক্ত। চমৎকার পড়াতেও পারেন। সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারও ভদ্রজনোচিত। তিনিই বিজলীর প্রাইভেট টিউটরের ভার নিলেন। তাঁর ডারউইনের থিয়োরী অফ্ ইভোল্যুশন সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনে বিজলীর বাবাও খুব তৃপ্ত। সহজ ভাষায় অমন জটিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা তিনি আর কখনো শোনেন নি। অতএব বিজলীও তাঁকে স্বামীরূপে পেলে ধন্য হয়ে যাবে—এইকথা ভেবে তিনি নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিজলীর বিবাহ দিলেন। আর ঠিক তার ক'মাস পরেই নরেন্দ্রের যথার্থ পরিচয় উদ্ঘাটিত হল। জানা গেল তাঁর আসল নাম নরেন্দ্রনাথ নয় পূর্ণ। আর চাকরীর জন্য তিনি যে সার্টিফিকেটগুলো শো করিয়েছিলেন সেগুলিও প্রকৃত পক্ষে মিথ্যা।

অবশ্য এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি কোন ছল চাতুরীর আশ্রয় নেন নি। বরং বিজলীর বাবাকে তিনি স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন, "কোথাও চাকরীর কোন যোগাড় করতে না পেরে আমি একটা বুদ্ধি বার করলাম শেষে। আমি নিজেই একটি বিজ্ঞাপন দিলাম যে, অমুক স্কুলের জন্য ভাল একজন শিক্ষক চাই—অমুক পোস্ট বক্সে দরখাস্ত করুন। অনেক দরখাস্ত এল। তার মধ্যে নরেন বাড়ুজ্জের কোয়ালিফিকেশন্ দেখলাম সবচেয়ে ভাল। তাকে লিখলাম যে, তোমার অরিজিন্যাল সার্টিফিকেট গুলি পাঠিয়ে দাও। তোমার চাকরি হবার খুব সম্ভাবনা। সেই সার্টিফিকেট গুলো হস্তগত হবার পর আমি আপনাদের স্কুলে দরখাস্ত করলাম।...তারপর আপনারা যখন আমাকে রাখলেন তখন তাকে সার্টিফিকেটগুলো ফেরত দিয়ে দুঃখের সঙ্গে জানালাম যে, অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তার মতন লোককে আমরা নিযুক্ত করতে পারলুম না ; কারণ ইন্সপেক্টর সাহেবের ইচ্ছা একজন মুসলমান নেওয়া। এই হল ট্রু ফ্যাক্ট।"

এই ঘটনায় নরেন্দ্রনাথের বুদ্ধির চাতুর্যই প্রমাণিত। পরে অবশ্য পাটের ব্যবসায় নামবেন বলে তিনি জানিয়েছেন। বিজলীর বাবাও তখন মেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে চুপ করে থাকাটাই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করলেন।

এবার শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কথা। তবে তাঁর ছোটগল্পে শিক্ষকের কথা ঠিক তেমনভাবে পাই না-কয়েকটি ছাড়া। যেমন তাঁর কাঞ্চনমূল্যে গল্পটি। এখানে মাস্টার মশাইয়ের ভূমিকা অবশ্য গৌণ। শুধু বর্ণিত হয়েছে, বন্ধুদের চক্রান্তের শিকার হয়ে কার্তিক নামে একটি ছেলে গিয়েছিল পার্কে খেলতে। কিন্তু পরদিন সে শুনল বন্ধুরা তার সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। স্কুল সেদিন বন্ধ ছিল না, খোলাই ছিল। অগত্যা লেট ফাইন দিতে হবে

তাকে। কারণ এমনিতে তার আগের দিন কামাই ছিল তার ওপর আরো একদিন বেড়ে যাওয়াতে মাইনের দেওয়ার ফিস্‌ও বৃদ্ধি পেল তার। তখন সে মাস্টার মশাইয়ের কাছে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল। "আমারা গরীব" বলে আর সে কিছু বলতেই পারল না। কিন্তু নির্দয় প্রকৃতির মাস্টার বললেন, তেমনটি কিছুতেই হবে না, আগে চার আনা পয়সা নিয়ে আসা হোক, তবে। কিন্তু তারপরেও যখন কার্তিক নড়বার নামটি করছে না তখন তিনি আরো নির্দয় হলেন। বলতে গেলে অমানবিক। লেখক বর্ণনা করেছেন, তখন এক ঘা ছড়ি কষিয়ে দিলেন তিনি কার্তিকের পিঠে। আর যারা তার এই সর্বনাশ করেছে সেই কুমার ও মণ্টি বন্ধু দুজনে তখন ফিক্‌ ফিক্‌ করে হাসছে।

শিবরাম চক্রবর্তীর গল্পেও আমরা পাই এই শিক্ষকের কথা। কিন্তু তাঁর অধিকাংশ গল্পেই এই শিক্ষকের চরিত্রটি এসেছে পরোক্ষ ভাবে। মহাপুরুষের সিদ্ধিলাভ, ঘটোৎকচ বধ, পৃথিবীতে সুখ নেই, চেয়ারম্যান চারু, প্রবীরপতন প্রভৃতি গল্প তারই উদাহরণ। কিন্তু মণ্টুর মাস্টার, পণ্ডিতবিদায়, শিক্ষা দেওয়া সহজ নয় প্রভৃতি গল্পগুলি এর ব্যতিক্রম। 'মণ্টুর মাস্টার' গল্পটিতে বর্ণিত হয়েছে মণ্টুর মাস্টার মিহিরের করুণ অবস্থা ও তা থেকে উদ্ধার লাভের কাহিনী। মিহির পাশ করে বসেই ছিল। কি করবে কিছুই তার স্থির ছিল না। এমন সময়ে আনন্দবাজারে দেখলে একটি বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে কর্মখালির। কোন এক বনেদী গৃহস্থের একমাত্র পুত্রের জন্য বি. এ পাশ করা গৃহশিক্ষক চাই। আহার ও বাসস্থান দেওয়া হবে, সঙ্গে থাকবে প্রতিমাসে ত্রিশ টাকা করে বেতন।

বিজ্ঞাপনটি পড়েই লাফিয়ে উঠল মিহির। অন্যান্য বেকার ছেলেদের মতই সে ভাবল, খাওয়া দাওয়াটা এমনিই হবে, সঙ্গে আবার বেতন। এম, এ টাও পড়া যাবে সেই সঙ্গে সিনেমা, ফুটবল ম্যাচ দেখার খরচেরও অভাব হবে না। এখানেই একটি বেকার ছেলের মনস্তত্ত্বকে সুন্দরভাবে রূপ দিয়েছেন লেখক।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে গিয়ে দেখা গেল ভদ্রলোকের কথাটি সত্য কিন্তু ছাত্রটি একেবারে গবাকান্ত। একটি ইংরেজি বানান তাকে যতবারই শেখানো হোক না কেন, সে যেকে সেই। তবু একান্ত টাকার লোভেই বেকার অসহায় যুবকের মতই থেকে গেল মিহির। তার শোবার বিছানাটিও বড় মনোরম। প্রথম দর্শনেই তার মনে হল বেশ ঘুমোন যাবে। কিন্তু রাত্রে শুতে গিয়ে দেখা গেল সেখানে কেবল ছারপোকা আর ছারপোকা। লক্ষ্য করার বিষয় বাড়ীর মাস্টারকে তথাকথিত ভদ্রলোক অভিভাবকেরা যে কিরূপ বিসদৃশ নজরে দেখেন, এগল্পের মিহির চরিত্রটি তারও প্রমাণ।

কিন্তু শত হলেও মিহির শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান। সে দেখলে সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। তাকে অন্যপথ অবলম্বন করতে হবে। তাই কারোকে কিছু

না ভেঙে মিহির কথার ছলে মণ্টুর বাবাকে এ'কথাই জানিয়ে দিল যে. ছার-পোকার মত মস্তিষ্কের উপকারী মেমারি বাড়ানোর মহৌষধি আর নেই। বিলেতে রীতিমতো ছারপোকার চাষ হয় এইজন্যে। অতএব মণ্টুর মেমারি বাড়ানোর জন্যে ছারপোকার প্রয়োজন। ব্যাস এতেই দফারফা হল। মণ্টু ও তার বাবা ছারপোকার বংশের একেবারে সদ্ব্যবহার করে ফেলল। মিহিরও রক্ষা পেল সেবারের মতো।

'পণ্ডিত বিদায়' গল্পেও বর্ণিত হয়েছে সংস্কৃত হেড পণ্ডিতের করুণ কাহিনী। সেবার সংস্কৃতে সকলেই ফেল করেছে। ছাত্রদের অভিযোগ হেড পণ্ডিত তাদের ভাল করে পড়ান না বলেই আজ এই অবস্থা। অতএব হেড পণ্ডিতই বা ছাড়বেন কেন? আত্মমর্যাদা বোধ সম্পন্ন তিনিও বললেন, "কি? অধ্যাপনা করি না? যতবড় মুখ নয় তত বড় কথা?"

তখন পদ্মলোচন বলে একটি ছাত্র বলে বসল তাহলে এই শ্লোকটার অর্থ করে দিন ত তিনি। বলেই একটি শ্লোক বলল পদ্মলোচন—

হবার্তাবা কহিপ্তাশা টজেগেণঃ শকেড়ুয়ে।
আণ্ডীব অণ্ডফ্রয়েন মানস্টেটওঃ শিবাঙ্গবঃ ॥

তখন ত পণ্ডিত পড়লেন মহাবিপদে। বাপের জন্মে এমন শ্লোক তিনি কখনো শোনেন নি। অবশেষে কথা দিলেন যে করেই হোক আগামীকাল এই শ্লোকের অর্থ উদ্ধার করে তবেই তিনি স্কুলে আসবেন। কিন্তু যার অর্থ কোন অভিধানেই নেই তার অর্থ তিনি পাবেন কোথায়?

তারপর দীর্ঘ আটদিন তিনি স্কুলে আসাই বন্ধ করে দিলেন। সারাদিন সারারাত ধরে তিনি কেবল শ্লোকটির অর্থই খুঁজে গেলেন। অবশেষে পদ্মলোচনই উদ্ধার করে দিল তার অর্থ। বলল, কতকগুলো কাগজের নামই ত সে ওলোট-পালট করে দিয়েছে। উল্টো থেকে পড়লেই এর মানে হয় এডুকেশন গেজেট, সাপ্তাহিক বার্তাবহ, বঙ্গবাসী, স্টেটসম্যান আর ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া। গল্পে হেড পণ্ডিতের চরিত্রটি নেহাৎ বোকা বলেই প্রতিভাত হয়েছে পাঠক চিত্তে। কেননা যে শ্লোকের কোন অর্থই হয় না, ক্লাসে সবার সামনে সে কথাটাই বা তিনি বলতে পারলেন না কেন? তবে কি তাঁর সংস্কৃত শিক্ষার কোনখানে ঘাটতি ছিল?

শিবরামের 'শিক্ষা দেওয়া সহজ নয়' গল্পেও রয়েছে এই কারুণ্য এবং শিক্ষকতা করার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা, একজন ভদ্রলোক যে কেন শিক্ষকতা করতে চান না তা নিয়েই গল্পের উদ্বোধন, "মাস্টারি কদাচ করিনি তা নয়। একবার করতে হয়েছিল কিছুদিনের জন্য, বকলমে যদিও। কিন্তু তার স্মৃতি আমার কাছে দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। শিক্ষা দিতে গিয়ে শিক্ষালাভ করতে কি কারো ভালো লাগে? কেউ বলুক।"

এইবার কল্লোলের সাধনা ও উত্তর সাধিক রূপে বলতে হয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের কথা। তাঁর কোন কোন শিক্ষক চরিত্রের সঙ্গে মিল আছে রবীন্দ্রনাথ ও তারাশঙ্করের। যেমন তাঁর 'সত্যবাদী সুকু' গল্পে চিত্রিত অনন্ত পণ্ডিতের চরিত্রটি। চরিত্রটি একেবারেই আমাদের ট্রাডিশন ঘেঁষা টোলের পণ্ডিতের মতো। তিনি সংস্কৃতের স্যার। তাঁর ক্লাসে বই না নিয়ে এলে আর রক্ষে নেই। যতক্ষণ তিনি পড়াবেন ততক্ষণ সকলকে বই ধরে বসে থাকতে হবে। অনন্ত পণ্ডিতের রামগাঁট্টার ভয়ে হরিপদ সেদিন তাই উপক্রমণিকার বদলে ভূগোলটা হাতে ধরে বসেছে, আর তাই দেখে পাশের ছেলেটা হেসে ফেলেছে খুক করে। ব্যাস! আর যায় কোথায়। অনন্ত পণ্ডিত তাঁর 'গজ গজৌ' থামিয়ে বললেন, "হাসলি কে রে? গজ শব্দ শুনে হাসি পেল কোন দিগ্‌গজের?"

সবাই তাঁকে খুব ভয় করে। তাঁর ক্লাসে একেবারে পিনকটি নট। সবাই তাই ভয়ে কাঠ হয়ে বসে আছে। এমন সময়ে একটি ছেলে তাঁকে জানিয়ে দেয় শশীর কথা। সত্যবাদী সুকুত্ত জানিয়ে দেয় "ও ভূগোল খুলে রেখেছে স্যার।" এর পরের অবস্থা যে রাগী অনন্ত পণ্ডিতের ক্লাসে কিরূপ আকার ধারণ করতে পারে, তা আমাদের সকলেরই অনুমেয়।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'চুরি' গল্পেও আছে প্যারীমোহন বাবুর কথা। ঠিক এই রকমই একটি ছোট গল্প লিখেছিলেন ছোট গল্পকার নরেন্দ্র মিত্র মশাই। তাঁর সেই গল্পের নাম ছিল 'হেডমাস্টার'। হেডমাস্টারের মতই প্যারীমোহন এখানে দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত। অভাবগ্রস্ত তিনি গেছেন তাঁর ছাত্র রাখালের কাছে। তিনি চিরকাল অত্যন্ত সাদাসিধে ও কড়া মাস্টার বলে পরিচিত। ছেলেদের পড়াবার জন্য তিনি সারাজীবন প্রাণপাত করে এসেছেন। তাঁর কোথাও এতটুকু ফাঁকি নেই। অন্যায় দেখলে তিনি বজ্রের মত কঠিন। প্যারীমোহন বাবুকে হাত করবার জন্য কিনা বলা যায় না, রাখাল বাড়ীতে বলে তাঁকে বুঝিয়ে বাড়ীর মাস্টার হিসেবে রাখার ব্যবস্থা করেছে। আর তারই দরুণ সে পরীক্ষার বেড়া টপকে পার হয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু বিশেষ সুবিধা তার কিছুই হয় নি। প্যারীবাবুকে দাম দিয়ে কেনা যায় না।

কিন্তু প্যারীবাবুর প্রতি রাখালের অনুরাগ বা শ্রদ্ধা না থাক কৃতজ্ঞতাটুকু ছিল। পরবর্তী জীবনে নিজের ছেলেকে পড়ানোর ভার তাই সে প্যারীবাবুর ওপর ছেড়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়েছে। কিন্তু রাখালের ছেলেও যথাসময়ে স্কুলের গণ্ডী পার হয়ে গেল। তারই কিছু আগে পৃথিবী শুদ্ধ বেধেছে যুদ্ধ ও প্যারীবাবুর অবস্থাও গিয়ে চরমে পৌঁচেছে। কোন বকমে নুন ভাত জোটাতেই তাঁর নুন আনতে পানতা ফুরোয় অবস্থা। প্যারীবাবুর চরিত্রটি অবশ্য আগাগোড়াই দারিদ্র্যের প্রতিভূ রূপেই চিত্রিত হয়েছে।

এবার পরিবেশের প্রভাবে মানুষ যে কতখানি নিজের আত্মসম্মানকে বিকিয়ে

দিতে পারে তারই প্রমাণ দিলেন তিনি। সোজা গিয়ে হাজির হলেন তাঁর প্রাক্তন ছাত্র রাখালের কাছে। রাখাল যত্ন আত্তি করলে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে পরিষ্কারই জানিয়ে দিল, তার কাছে বড় একটা সুবিধে হবে না। তাছাড়া ছেলের অঙ্কের মাস্টার মশাই বলেও যে সে প্যারীবাবুকে রাখবে তারই বা উপায় কোথায়? "স্কুল কলেজে ঢুকলেই ছেলেদের মাথা-গুলো একটু গরম হয়ে যায় কিনা! স্কুলের মাস্টারদের তখন মনে করে ওল্ড ফসিলস্, কলেজের প্রফেসারের কাছে না পড়লে বাবুদের তখন মান থাকে না। আচ্ছা তবু আমি বুঝিয়ে বলে দেখবখন। আপনি বরং খোঁজ নেবেন এর মধ্যে একদিন।"

এদিকে বাড়ীতেও তাঁর কি অবস্থা! বাড়ীর মেয়ে পুলিনবাবুর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। আগে কেউ বাইরে বেরুলে তাঁর অনুমতি নিত, কিন্তু এখন সে অনুমতি নেওয়ারও কেউ প্রয়োজন বোধ করে না। কিন্তু তিনি সরল ও সত্যাশ্রয়ী বলে নির্বোধ নন। শুধু এতদিন তিনি নিজেকে নিয়েই মগ্ন ছিলেন কিন্তু সেদিন দেখলেন বাড়ীটার সবই যেন ধ্বসে যাচ্ছে। শ্রী, শালীনতা, ভদ্রতা সব। তার দুর্বল ইঁটগুলো পর্যন্ত নোনা ধরার বিষক্রিয়া ঠেকাতে না পেরে ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে। সংসারকে যেন বিষধর সর্প গ্রাস করেছে। এদিকে ছেলেও কি যেন চুরি করে বাড়ী ফিরেছে। তাই সবদিক মিলিয়ে তার ট্র্যাজিক পরিণতি আমাদের অন্তরকেও গভীরভাবে স্পর্শ করেছে।

এবার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে শিক্ষককে আমরা তেমন কোন আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হতে দেখি না বরং যুগের পরিবর্তনে তাঁরা বড় বেশি প্র্যাকটিক্যাল হয়ে গিয়েছেন এইটিই লক্ষ্য করি পরম বিস্ময়ে। আসলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝেছিলেন শিক্ষকেরাও মানুষ, তাঁদেরও খেয়ে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। আর সে অধিকার পূরণ না হলে তাঁরাও ধর্মঘট করবেন, এতো খুবই স্বাভাবিক। তাঁর 'টিচার' গল্পেই এর বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সমালোচকও এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন, যাঁরা নিজেদের পদমর্যাদার সুযোগ নিয়ে শিক্ষকের দারিদ্র্যের মাহাত্ম্য প্রচার করে থাকেন, তাঁদের মুখোশ খুলে দিয়ে শিক্ষকদের আত্মমর্যাদা রক্ষার কাহিনীই বিবৃত হয়েছে তাঁর 'টিচার' গল্পে।

গল্পে দেখা যায় রাজমাতা হাইস্কুলের সেক্রেটারি রায়বাহাদুর অবিনাশ তরফদার কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না যে বেতনের জন্য শিক্ষকেরা ধর্মঘট করবেন। কারণ ব্যক্তিস্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়ে বিলাসের লোভ জয় করে বা স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্র্যকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়ে যাঁরা বিদ্যাদানের মহান্ আদর্শে ব্রতী হয়েছেন, তাঁরা সামান্য দুটো পয়সার জন্য অসভ্য মজুর ধাঙড়ের মত যে ধর্মঘট করবেন তা কখনই হতে পারে না।

কিন্তু স্কুলের গিরীন মাস্টার মশাইই একদিন এই কথার তীব্র প্রতিবাদ

জানায় তার বাড়ীতে রায় বাহাদুরকে নিমন্ত্রণ করে, প্রকারান্তরে যা গিরীনের সাহসেরই পরিচায়ক। সে বলে, "সকাল সকাল গিয়ে আশীর্বাদ করে আসবেন শুধু একটু ফলমূল মুখে দেবেন। সবাই আশা করছি, মনে বড় আঘাত পাব না গেলে।"

রায়বাহাদুর যেন গিরীনের বাড়ী যেতে মনস্থ করেছেন ধরে নিয়েই গিরীন আবার বলে, "একটা কথা বলি আপনাকে, দোষ নেবেন না। খেলনা বা বা উপহার কিছু নিয়ে আসবেন না খোকার জন্য। আমাদের বংশের রীতি আছে, একগাছি তৃণ নিলেও নাকি বংশের সর্বনাশ হবে।"

এ থেকে আপাত অর্থে গিরীনের বিনয়ী স্বভাব ও নম্রতাবোধের ছাপ ফুটে উঠলেও তার আসল উদ্দেশ্য কিন্তু অন্যবিধ। তার আসল উদ্দেশ্যই হল রায়বাহাদুরকে অপমান করা, রায়বাহাদুরকে জানানো যে তারা কত গরীব।

কিন্তু যাইহোক শেষ পর্যন্ত প্রায় দশটা নাগাদই রায়বাহাদুর গিরীনের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলেন। অন্নপ্রাশনের দিনই, গিরীনের কথা অনুযায়ী। কিন্তু বাড়ী দেখে প্রথমে একটু আশ্চর্যই হয়ে গেলেন তিনি। এত পুরনো, এমন দীনহীন চেহারার একতলা পাকা বাড়ী হয়, তা রায়বাহাদুর জানতেন না। কারণ এর চেয়েও খারাপ বাড়ী চারদিকে অসংখ্য ছড়ানো থাকলেও তার কোনটার দিকে তাঁর নজর যায়নি কখনো। এ ধরণের বাড়ীর অধিবাসী কস্মিনকালেও তাঁকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করতে সাহস পায়নি।

এর পরের অবস্থা অবশ্য আরও শোচনীয়। কারণ গিরীন যখন তাঁকে তার দারিদ্র্যের ছিদ্রগুলো একে একে ধরিয়ে দিচ্ছিল সুন্দর কৌশলে, তখন রায়বাহাদুর বেশ বুঝতে পারলেন যে শিক্ষকদের আদর্শ নিয়ে যে দীর্ঘ বক্তৃতা তিনি দিয়েছিলেন, শিক্ষকদের ধর্মঘট করার বিরুদ্ধে, গিরীন তারই উচিত জবাব দিচ্ছে। অথচ প্রতিবাদ জানানোর ঢংটি তার এতই ভদ্রোচিত যে রায়বাহাদুরের মত মানুষও আপাতভাবে তাকে হজম করে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। বলছেন, "অ্যাপলিকেশন্ দিও, ও মাস থেকে দশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেব। তুমি ভাল পড়াও শুনেছি। আর বাকি মাইনেটাও বরং পাইয়ে দেব তোমায় সোমবার।"

কিন্তু গিরীন বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ। সে জানত ওসব রায় বাহাদুরের মুখের কথা। তাই ঘুরিয়ে নাক দেখিয়ে সে বললে, "তা করবেন না স্যার। লোকে বলবে ছেলের মুখে ভাতের ছলে আপনাকে বাড়িতে ডেকে খাতির করে মাইনে বাড়িয়ে নিয়েছি, বাকি মাইনে আদায় করেছি। আমার সর্বনাশ করবেন না স্যার।"

শেষ পর্যন্ত গিরীন বরখাস্তের নোটিশ পায়। সে যা প্রত্যাশা করেছিল তাই ঘটে। তবে একটি কথা ভেবে তার বড় আনন্দ হয়। এরপর রায়বাহাদুর

যখন শিক্ষকদের আদর্শ নিয়ে বড় বড় কথা বলতে যাবেন, তখন তা শোনাতে গিয়ে তাঁর কথাগুলি যাবে আটকে উচ্ছ্বাসটাও হবে মন্দা। দয়া মায়া সহানুভূতিতে নয়, ভয়ে। মোট কথা মানিকের বিদ্রোহী সত্তাই এখানে গিরীন চরিত্রটির মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

এরপর বলতে হয় লেখক সুবোধ ঘোষের কথা। তাঁর একাধিক ছোটগল্পেই শিক্ষকের প্রসঙ্গটি এসেছে। তবে 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' গল্পে যেভাবে এসেছে অন্যত্র ঠিক সেইভাবে আসে নি। অধ্যাপক বিমল বসুর চরিত্রটি এখানে সত্যিই জটিল। তিনি কলেজের অধ্যাপক। তাঁর পড়ানোর ভঙ্গিতেও এক আশ্চর্য রকমের যাদু। অন্যান্য অধ্যাপকেরা যেখানে সকলেই পড়ান, বই ঘাটেন এবং পড়াতে গিয়ে যথেষ্ট ভয়ও পাইয়ে দেন সেখানে বিমলবাবু কিছুই করলেন না, শুধু ইতিহাসের নামে একটি বক্তৃতা দিলেন। কিন্তু কি অদ্ভুত সেই বক্তৃতা। বক্তৃতা বলে যেন মনেই হয় না। যেন একটা অভিনয়, যেন নাটকে চন্দ্রগুপ্ত মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা আর প্রতিজ্ঞার কথা অনর্গল বলে চলেছেন। তারপরই বললেন, "আমি ইতিহাসের প্রফেসার, ইতিহাস আমার স্বপ্নে, ইতিহাস আমার রক্তে ও স্নায়ুতে।"

মাধবের আজও মনে পড়ে কলেজের সেরা অধ্যাপকই হলেন এই বিমলবাবু। তাঁর চেহারাটিও বেশ। সাজ পোশাকেও ছিল একটা ছিমছাম স্টাইল। তিনি যে ইতিহাসকে কতখানি ভালবাসেন, তা তাঁর সিল্কের ধুতি পরার মাধ্যমেও প্রমাণিত। কারণ তিনি নিজেই বলতেন, সিল্ক হল চীনাংশুক। এই সিল্কের সঙ্গে ইতিহাসের মস্তবড় একটা স্মৃতির এসোসিয়েশন্ রয়েছে। সুদূর অতীতে ভারতের সঙ্গে চীনের যে একটি অন্তরঙ্গ সম্পর্কের বন্ধন ছিল, এই সিল্কের মধ্য দিয়েই তার যেন একটি স্পর্শ অনুভব করা যায়।

তিনি সত্যিই জিনিয়াস। কলেজের চারুবাবুও মাধবের কাছে স্বীকার করেছেন সেকথা—উনি একটা গ্রেট ইনটালেকচুয়াল। পৃথিবীর ইতিহাসের "সবচেয়ে মহৎ" ব্যক্তি মহারাজ অশোকের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। অশোকের জীবন আর কীর্তি নিয়ে এমন সব নতুন নতুন কথা তিনি শোনান যা পাঠ্য বইয়ের মধ্যে কোথাও লেখা থাকে না। অশোকের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা যে কতখানি প্রগাঢ় ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁরই একটি উক্তিতে, "অশোক সম্বন্ধে আমি আড়াইশো ছোটবড় বই পড়েছি, অশোক স্তম্ভের ছায়ায় বসে দশটি দুপুর কাটিয়েছি। আমাকে যদি বুঝতে পার, অশোককেও তোমরা বুঝতে পারবে। আর অশোককে যদি বুঝতে পার, তবে আমাকেও বুঝতে পারবে।" সুতরাং তিনি শুধু ইতিহাসের অধ্যাপকই নন সেই সঙ্গে একজন কবিও বটে।

এখনও বিয়ে করেন নি প্রফেসার বসু। নিজের মন আর পাটলী পুত্রের

স্বপ্ন নিয়েই যেন এক ভাবরাজ্যের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। চারুবাবুর মত কেবল পড়িয়েই তিনি টাকা রোজগার করেন না। যুগের স্বার্থ লোভ আর মতলব থেকে অনেক অনেক উর্ধ্বে রয়েছেন অধ্যাপক বসু। তখন তিনি একটি বইও লিখছিলেন। মাধবই তাঁর বাড়ীতে গিয়ে আবিষ্কার করেছে এই লেখক বিমলবাবুকে। কথায় কথায় তিনি তখন মন্ত্রের মত সব ছড়া আওড়ে যাচ্ছিলেন। বলে দেন বলেই বোঝা যায় ভাষাটা মাগধী প্রাকৃত। তাঁর বিছানার ওপরেও ছিল অশোকের যত শিলালিপির ছবি। সত্যই তিনি "একজন খাঁটি অশোকিস্ট।"

যারা পড়তে চায় জানতে চায় তাদের কাছে সত্যই তিনি একজন বিরল আদর্শের প্রতিভূ। তিনি শুধু ক্লাসের পড়ানোতেই তাঁর দায়িত্ব শেষ করেন না সেইসঙ্গে জানানও অনেক কিছু। কারণ পাশ নম্বর পেয়ে শুধু ক্লাসের ওঠার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে তিনি। সর্ব সম্প্রদায়ের প্রতিই তাঁর গভীর শ্রদ্ধা।

কিন্তু সেদিন ইতিহাসের ক্লাসটাই কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। কারণটি অভিনব কিছুই নয়। বেঞ্চের প্রথম সারিতে বসেছিল একটি মেয়ে, স্টেলা হেমব্রাম। হঠাৎ প্রফেসার বসুর গলার সরও গেল পালটে, "সম্রাট অশোকের সবচেয়ে মহৎ কীর্তি কি? কেন তিনি ইতিহাসের মহত্তম মানুষ? তিনি ছিলেন প্রেমিক। সে প্রেম সেকালের আভিজাত্যের বন্ধনে বাঁধা ছিল না। তিনি অনার্যকে আপন করে নিয়েছিলেন শুধু মুখের কথায় নয়, প্রেমের উপহারে। সেই বিদিশা নগরের উপান্তে এক অরণ্যময় রাজ্যের ভীল কন্যাকে তিনি বিবাহ করেছিলেন।

এখানে বিমলবাবুর উদারহৃদয় অথবা চারিত্রিক অবনতির কারণে অনেকেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা কিম্বা অশ্রদ্ধা দুইই প্রকাশ করতে পারেন কিন্তু মাধবের এতে বড় ভালই লেগেছিল বিমলবাবুকে। কিন্তু কিছুদিন পর আবার একি শুনছে মাধব "ভীল নারী অশোকের জীবনের বাধা হয়ে উঠছে। সেই বাধাকে অনেকদিন ধরে ক্ষমা করলেন অশোক, কিন্তু যখন আর ক্ষমা করা গেল না, তখন তিনি চলে গেলেন এবং জীবনে আর কোনদিন তার কাছে ফিরে আসেন নি তিনি। পরে শোনা গেল প্রফেসার বিমল বসুও কলেজের চাকরী ছেড়ে দিয়ে কলকাতার মস্ত এক বড় লোকের মেয়েকে বিবাহ করেছেন। যৌতুকও পেয়েছেন অনেক কিছু। চারুবাবুর মুখেই শোনা গেল এ'সব কথা।

এবার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রসঙ্গ। তাঁর একাধিক গল্পের মত 'হেডমাস্টার' গল্পটিতে এই শিক্ষকের কথা এসেছে। তিনিও ছাত্রবৎসল ও আদর্শের প্রতিভূ রূপেই গল্পে চিত্রিত। কুসুমপুরের এম. ই স্কুলের এই হেডমাস্টার মশায়ের পুরো নাম শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সরকার। কিন্তু কালের বিবর্তনে শত চেষ্টা সত্ত্বেও সে স্কুল উঠে গেলে তিনি হাজির হন তাঁরই প্রাক্তন ছাত্র নিরুপমের কাছে। নিরুপম তখন মস্ত লোক। সে তার মাস্টার মশাইকে একটা চাকরীও ঠিক করে

দেয়। কিন্তু মেজাজী ও আদর্শবান কৃষ্ণপ্রসন্ন সে চাকরী বারবারই খোয়াতে বসেন। সেখানে কোন লোকের সঙ্গেই তাঁর বনিবনা হয় না। শেষ পর্যন্ত ছাত্র নিরুপমও তাঁকে ভুল বুঝতে শুরু করেন। আর এখানেই তাঁর অভিমান বোধ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। প্রবল আত্মমর্যাদা বোধ সম্পন্ন হেডমাস্টার মশাইও তার ওপর অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু শেষপর্যন্ত অফিসের মিঃ গুপ্তের কাছেই নিরুপম শুনতে পায়, তাঁর মাস্টার মশায়ের চরিত্রটি খুব একটা ভাল নয়। বলাই নামে অফিসের যে বেয়ারাটি আছে, তার আস্তানায় গিয়েই তিনি আড্ডা দেন অফিস ছুটির পর।

নিরুপমের সন্দেহ হয়। কিন্তু গিয়ে দেখেন অফিসের বেয়ারাদের নিয়ে তিনি ক্লাস করছেন। অফিসের এফিসিয়েন্সি বাড়াবার জন্য। লেখাপড়াটা তাদের তিনি ধরিয়ে দিচ্ছেন। সব দেখে নিরুপমেরও মাথা অবনত হয়ে আসে কৃষ্ণপ্রসন্নের প্রতি শ্রদ্ধায়। আসলে সারা জীবন ধরে তিনি মাস্টারি করেছেন তাঁর যে অফিসের চাকরী কোনমতেই পোষাবে না, বিশেষতঃ বুড়োবয়সে, কৃষ্ণপ্রসন্ন তারই প্রমাণ। তাঁর প্রতি আমরাও শ্রদ্ধায় নতমুখ না হয়ে পারি না।

এবার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা। তিনি ব্যক্তিগত জীবনেও ছিলেন অধ্যাপক। তাঁর অসংখ্য ছোটগল্পেই তাই শিক্ষকের চরিত্রটি অঙ্কিত হয়েছে বেশ সহমর্মিতার সঙ্গে। তাঁর 'খাঁড়ামশাই' গল্পে আছে, হেডমাস্টার শ্রীনাথ আচার্যিও স্কুলের জুনিয়ার টিচার বিনল বাবুর কথা। বিমলবাবু জুনিয়ার হলে কি হয়, যেমন বুদ্ধিমান তেমনি চটপটে। খুব ভাল পড়ান। সব কাজেই হেডমাস্টার তাঁর পরামর্শ নেন। সেদিনও নিলেন। বিমলবাবু আসতেই হেড মাস্টার মশাই বলে বসলেন, "দ্যাখো কাণ্ড। খাঁড়া মশাই ডেকে পাঠিয়েছেন। তখনই তোমায় বললুম, প্রেসিডেন্টের ছেলে—দিয়ে দিই প্রমোশন। কী হবে ঝামেলা করে! কিন্তু তোমার কথায় ওকে আটকে দিলুম, এখন।"

কিন্তু বিমলবাবু নীতিবাগীশ। তিনি আইন মেনে চলেন। অন্যায় কিছু হলে তা তিনি একেবারেই সহ্য করেন না। তাই বললেন, "প্রেসিডেন্টের ছেলে তো কী হয়েছে, ফেল করলেও প্রমোশন দিতে হবে? তাহলে গরীবের ছেলেরা আর কী দোষ করল, সব্বাইকে তো পাশ করিয়ে দেওয়া উচিত।"

কিন্তু সে যাইহোক সকলকেই শেষে যেতে হল খাঁড়া মশাইয়ের কাছে, একেবারে যে দুটি প্রশ্নপত্রে তাঁর ছেলে ফেল করেছে সেদুটিকে সঙ্গে নিয়ে। খাঁড়ামশাই প্রথমেই ভূগোলের প্রশ্নটি হাতে করে নিয়ে বললেন, তাতে ত সব দেশ বিদেশের খবর জানতে চাওয়া হয়েছে বলে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এই দেশের ভূগোলের সব খবরই কি তাঁরা রাখেন বলেই তিনি একটা প্রশ্ন করে বসলেন হেড মাস্টার মশাইকে, "বলুন দিকিনি, আমাদের এই জেলায় কটা গ্রাম আছে?" তখন তিনি ও বিমলবাবু একে অপরের মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগলেন। বেশ

বুঝতে পারলেন তাঁরা বিপাকে পড়েছেন। তাই শেষে আর অঙ্ক প্রশ্ন নিয়ে কোন রকম প্রশ্নই তুললেন না। তাঁরা একেবারে বোকা বেনে গিয়েছেন। শেষে বিমলবাবুই বললেন, "খাঁড়ামশাই শিক্ষা তো স্কুলের জিনিস নয়। তার অর্ধেক ঘরে, অর্ধেক স্কুলে। অভিভাবক যদি তাঁর কাজ না করেন, আমরা কতটুকু করতে পারি বলুন। এই ঘরের শিক্ষাটা আমরা পাইনি বলেই তো আপনার কথার জবাব দিতে পারিনি। আপনারা এইসব শিখিয়ে পড়িয়ে দিন, আমরা সারা দুনিয়াকে চিনিয়ে দিই। আপনি তো গুড়ের ব্যবসা করেন, আপনার ছেলেও কি জানে—বাংলা দেশের কোথায় কোথায় আখের চাষ হয় ?" এতে বিমলবাবুর যুক্তিবোধই প্রমাণিত। সেইসঙ্গে তাঁর যে উপস্থিত বুদ্ধি আছে তাও স্বীকার করতে হয়। তাই খাঁড়ামশাইয়ের মতো লোকও পরে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, "ফেল করিয়েছেন, বেশ করেছেন—কেরলের রাজধানীর খবর দিতে না পারলে আরো সাতবার ফেল করিয়ে দেবেন।"

এবার সবশেষে সমরেশ বসুর কথা। তাঁর 'সাধ' গল্পে বর্ণিত হয়েছে গোপীনাথ ও নমিতার মেয়ে কলি যে স্কুলে পড়ে সেখানে পড়ে মস্ত বড়লোকর সব ছেলেমেয়েরা। বহু কষ্টে তাই অন্যের মেয়ে বলে পরিচয় দিয়ে রিক্সাওয়ালা গোপীনাথ তাকে সেখানে ভর্তি করেছিল অনেক সাধ নিয়ে। দিদিমনিরাও তাকে খুব ভালবাসেন। তার আদরের মেয়ে কলি তাঁদের আদর খায়, দুষ্টুমি করলে চোখ পাকানো মিষ্টি বকুনি। গোপীনাথ এ'সব দূর থেকে লুকিয়ে দেখে। তার মনে হয় বাগানে সে ফুলের খেলাই দেখছে। তার মধ্যে একটি তার নিজের। তার আত্মজা। দিদিমনিদের চরিত্রে এখানে জননীসুলভ দিকটিকেই চিত্রিত করা হয়েছে, তাঁদের অন্য কোন দিককে নয়।

বিদ্যাসাগরের ধর্মভাবনা

বিদ্যাসাগর আস্তিক ছিলেন কি নাস্তিক ছিলেন সেই সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক শ্রীশঙ্করী প্রসাদ বসু তাঁর 'রসসাগর বিদ্যাগাগর' গ্রন্থে জানিয়েছেন যে তিনি নাস্তিক হলে অবশ্য পৃথিবী রসাতলে যেত না, হিন্দু পৃথিবীও নয়। কেননা ভারতীয় হিন্দু সমাজে নাস্তিকেরা ব্রাত্য নন। প্রমাণের অভাবে ঈশ্বর অসিদ্ধ একথা বলতেও এদের শাস্ত্রীদের আটকায় নি। সুতরাং হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত নাস্তিক বিদ্যাসাগর বলতে আপত্তির কারণ কি? আপত্তির কারণ আর অন্য কিছুতে নয়, অযথার্থ কথায়, বিদ্যাসাগর যা ছিলেন না তাঁকে তাই প্রমাণ করার চেষ্টার বিরুদ্ধে। বিদ্যাসাগর কি সত্যকে ভালবাসতে শেখান নি?

কিন্তু সেকালে ব্যাপারটিকে অনেকেই এভাবে দেখেন নি। কারণ প্রচলিত অর্থে ধার্মিক বলতে যা বোঝায়, বিদ্যাসাগর সেই অর্থে ধার্মিক ছিলেন না বলে অনেকেই তাঁকে নাস্তিকের শিরোপা দিয়েছেন। স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথই তাঁকে "নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ" বলে অভিহিত করেছেন। আবার কৃষ্ণকমল মশাইও লিখেছেন, "বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন, একথাটা বোধহয় তোমরা জান না। যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা কিন্তু সেবিষয় লইয়া তাঁহার সঙ্গে কখনো বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না।"

কিন্তু কৃষ্ণকমল বাবুর কথাকেই যদি সত্য বলে ধরে নিতে হয়, তাহলে কিভাবেই বা তিনি তাঁর 'বোধোদয়' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে লিখলেন, "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন"।

কিংবা "ঈশ্বর কি প্রাণী, কি উদ্ভিদ্, কি জড়, সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ নিমিত্ত ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা বলে। ঈশ্বরকে কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন। আমরা যাহা করি তাহা তিনি দেখিতে পান, আমরা যাহা মনে ভাবি, তিনি তাহা জানিতে পারেন। ঈশ্বর পরম দয়ালু; তিনি সমস্ত জীবের আহার দাতা ও রক্ষাকর্তা।"

অথবা "ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। ঈশ্বর কেবল জন্তুদিগকে চেতনা দিয়াছেন। তিনি ভিন্ন আর কাহারও চেতনা দিবার ক্ষমতা নাই। দেখ, মনুষ্যেরা পুত্তলিকার মুখ, চোখ, নাক, কান, হাত, পা সমুদয় গড়িতে পারে, এবং উহাকে ইচ্ছামত বেশভূষাও পরাইতে পারে। কিন্তু চেতনা দিতে পারে না; উহা অচেতন পদার্থই থাকে, দেখিতেও পায় না, শুনিতেও পায় না, চলিতেও পারে না, বলিতেও পারে না।"

কিন্তু অনেকেই বলবেন 'বোধোদয়' গ্রন্থে লিখিত ঈশ্বর সম্পর্কিত কথাগুলি ত সবই বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কথা। কারণ বিদ্যাসাগর মশাইকে ত তিনিই বলেছিলেন, "মহাশয় ছেলেদের জন্য এমন সুন্দর একখানি পাঠ্যপুস্তক রচনা করিলেন, বালকদের জানিবার সকল কথা তাহাতে আছে, কেবল ঈশ্বরের কথা নাই কেন?" কিন্তু নিছক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কথাতেই যদি তিনি তাঁর 'বোধোদয়' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে ঈশ্বর প্রসঙ্গের অবতারণা করেন তাহলে প্রশ্ন থেকে যায়, তবে কি তিনি লোকের কথাতেই চালিত হতেন? নিজের যুক্তিবোধের দ্বারা কি নয়? তাহলে ত বিদ্যাসাগর মশাইয়ের চরিত্রটিই আমাদের কাছে পাল্টে যায়? বিদ্যাসাগরকে কি আমরা সেইভাবে ভাবব? তাছাড়া নেহাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি তিনি বালকদের মাঝে ঈশ্বর সম্পর্কে একটি সচেতনতা গড়ে তুলতেও এই প্রসঙ্গের অবতারণা করেন তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়, তবে তিনি ঐ পুস্তকের অন্য রচনাতেও বা ঈশ্বর সম্পর্কে এত অধিক কথা বললেন কেন?

অবশ্য কেউ কেউ পাল্টা প্রশ্ন করে বলতে পারেন, যে বিদ্যাসাগর মশাই তাঁর 'বোধোদয়' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণেই বা ঐ বিষয়ে তুষ্ণীভাব অবলম্বন করেছিলেন কেন? এর উত্তর খুবই স্পষ্ট। কারণ বিদ্যাসাগর মশাই চিরকালই ছিলেন ধর্ম বিষয়ে তুষ্ণীভাব অবলম্বনের পক্ষপাতী (তাঁর নিজের কথায় যাঁকে জানবার জো নেই তাঁর অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করা সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই নয়) কিন্তু ভেতরে যাঁর পূর্ণসত্তায় বিশ্বাস মজ্জাগত, তাঁর ত মাঝে মাঝে প্রকাশ হবেই। সুতরাং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কথাটি এক্ষেত্রে প্রদীপের সলতে উসকে দেওয়ার মতই কাজ করেছিল বলে মনে হয়।

তথাপি নিজের ধর্মবিশ্বাসকে তিনি কখনো ঢাক পিটিয়ে বলে বেড়ান নি। কারণ ধর্মপ্রচারকে তিনি ধর্মপ্রচারকদের "দলবাঁধা কাণ্ড" বলেই মনে করেছিলেন। এ'বিষয়ে তাঁর ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রই লিখেছেন—
করেছিলেন। এ'বিষয়ে তাঁর ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রই লিখেছেন—
করেছিলেন। এ'বিষয়ে তাঁর ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রই লিখেছেন—

[illegible] কহিতেছিলেন, [illegible] ধর্ম্মপ্রচারক ও কয়েকজন কৃতবিদ্য ভদ্রলোক আসিয়া উপবেশন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়, ধর্ম্ম লইয়া বঙ্গদেশে বড় হুলস্থুল পড়িয়াছে, যাহার যা ইচ্ছা সে তাহাই বলিতেছে, এ বিষয়ে কিছুই ঠিকানা নাই। আপনি ভিন্ন এ বিষয়ের মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা নাই, এই কথায় দাদা বলিলেন ধর্ম্ম যে কি, তাহা মনুষ্যের বর্তমান অবস্থায় জ্ঞানের অতীত এবং ইহা জানিবারও কোন প্রয়োজন নাই……বলিয়া একটি গল্প আরম্ভ করিলেন।

এক দিবস মৃত্যুরাজ কর্ম্মচারীগণ সহ কাছারি খুলিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে প্রহরী এক ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া আনিলে মৃত্যুরাজ তাহাকে বলিলেন, তুমি অমুকের উপাসনা না করিয়া কিজন্য অমুকের উপাসনা করিলে।…

এইরূপ তিন চারিজন উপাসককে দণ্ড দিবার পর আপনার মত একজন ধর্ম্ম-প্রচারক আনীত হইলেন। ঐ ধর্ম্মপ্রচারককে জিজ্ঞাসা কয়ায় তিনি বলিলেন, বিদ্যাসাগরের উপদেশানুসারে আমি অমুকের উপাসনা করিয়াছি এবং অনুগামী ব্যক্তিদিগকেও ঐ উপাসনার উপদেশ দিয়াছি। মৃত্যুরাজ প্রথমতঃ নিজের হিসাবে পাঁচ বেত দিয়া অনুগামী উপাসকদিগকে আনাইয়া প্রত্যেকের হিসাবে পাঁচ পাঁচ বেতের আদেশ দেন। এইরূপ দুই তিনজন প্রচারকের পর আমিও মৃত্যুরাজের সম্মুখে নীত হইলাম।...প্রত্যেক প্রচারকের হিসাবে পাঁচ পাঁচ বেত হুকুম দিলেন। ইহাতে আমার শরীরে তিলার্দ্ধ স্থান রহিল না, তথাপি বহুসংখ্যক বেত বাকী রহিল।"

আসলে বিদ্যাসাগর মশাই বিশ্বাস করতেন, "ঈশ্বর বা শাস্ত্রনির্দিষ্ট পারমার্থিক চিন্তার পথে চলিলে নিশ্চয় তাঁহার প্রিয়পাত্র হইব, স্বর্গরাজ্য অধিকার করিব, এ সকল বুঝিও না, আর লোককেও তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিও না। লোককে বুঝিয়ে শেষটা কি ফ্যাসাদে পড়ে যাব? একে ত নিজে কত শত অন্যায় কাজ করিয়া নিজের পাপের বোঝা ভারী করিয়া রাখিতেছি, আবার অন্যকে পথ দেখাতে গিয়া তাহাকে বিপাকে চালাইয়া কি শেষটা পরের জন্য মার খাইয়া মরিব। নিজের জন্য যাইহোক পরের জন্য বেত খেতে পারব না বাপু। একার্য আমাকে দিয়ে হবে না। নিজে যেমন বুঝি, সেই পথে চলিতে চেষ্টা করি, পীড়াপীড়ি দেখিলে বলিব এর বেশী বুঝিতে পারি নাই।"

এই বক্তব্যের উদাহরণ স্বরূপ আমরা পূর্বেই একটি উদাহরণ দিয়েছিলাম, প্রসঙ্গতঃ আরো একটি উদাহরণ—

সেবার কাশী থেকে আসার পর বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা হয় হরানন্দ বাবুর। বিদ্যাসাগর তাঁকে বললেন, কাশীতে ত বাস করছ, তা একটু গাঁজা টাঁজা খেতে শিখেছ ত? হরানন্দ ত অবাক। অবশেষে বিদ্যাসাগরই বুঝিয়ে বললেন ব্যাপারটা। বললেন "কাশীতে মরলে শুনেছি মানুষ শিব হয়। আর শিব হলেই ত জান নন্দীভৃঙ্গি এসে জুটবে, তা তারা তখন গাঁজা আনবে তখন ত তা টানতেও হবে। নইলে শিব হওয়া কিসের।"

কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এ শুধুই বিদ্যাসাগরের রঙ্গরস প্রিয়তার উদাহরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ ধর্মে তিনি ঠিকই বিশ্বাসী ছিলেন (যে ধর্মের স্বরূপ প্রবন্ধটির মাধ্যমেই প্রতিপন্ন হবে), কিন্তু তার আগে আমরা একটা অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করে নিতে চাই। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে বিদ্যাসাগর মশাই ধর্মকে ধর্ম প্রচারকদের "দলবাঁধা কাণ্ড" বলেই মনে করেছিলেন। কিন্তু তাহলে প্রশ্ন ওঠে তবে কি তিনি ব্রাহ্মদলে যোগদান করেননি? তিনি প্রার্থনা সভায় না গেলেও তাঁদের কি প্রতি মাসে মাসে চাঁদা দেন নি? হ্যাঁ দিয়েছিলেন, তবে তা ধর্মের টানে আদৌ নয়, সাহিত্যের

টানে। কারণ ব্রাহ্মসভা তখন সাহিত্য সেবার জন্য অনেক কিছুই করেছিল। বিদ্যাসাগর মশাইও সম্ভবতঃ সেই কারণেই তাঁদের দলভুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। আবার মনোমালিন্য হলে সে দল ছেড়ে তিনি চলেও আসতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। তবে প্রশ্ন থেকে যায়, একেবারে নাস্তিক হলে কি তাঁর পক্ষে এই রকম একটি ধর্মসংগঠনেব সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করা সম্ভব?

দেখা যায় আরো অনেক ধর্মসংগঠনের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। আর তা নিছক ধর্মের টানে বলেই মনে হয়। এ'বিষয়ে জনৈক সমালোচক তাঁর 'বিদ্যাসাগর পরিক্রমা' গ্রন্থে লিখছেন, ১৮৪৩ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী জোড়াবাগানে রামনারায়ণ মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে যে 'Hindu philanthropic society' স্থাপিত হয় তার অসংখ্য সভ্যের মধ্যে বিদ্যাসাগর মশাইও ছিলেন একজন। একবার তিনিই এই সভার কার্যপ্রণালী ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, "যাহাতে 'একমাদ্বিতীয়ম্' পরমেশ্বরের প্রতি অনুরাগ উদ্দীপ্ত হয় তজ্জন্য এই সভা সংস্থাপিত হইয়াছে।"

অথবা, "ঈশ্বর, পরলোক, সত্য ও সুখ সম্বন্ধে যুক্তিসম্মত ও উন্নত অভিমত প্রচার করাই বিশ্ব প্রেমোদ্দীপনী সভার উদ্দেশ্য। হিন্দুগণকে পরমাত্মা এবং সত্য রূপে ঈশ্বরকে পূজা করিতে শিক্ষা দেওয়া এবং তাঁহাদিগের সৃষ্টিকর্তা, স্বজাতীয়গণ এবং আপনাদিগের প্রতি যে সকল নৈতিক ও পবিত্রতম কর্তব্য আছে, তাহা পালন করানো আমাদিগের অভিলষিত উদ্দেশ্য।"

বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব ও অন্যান্য রচনাবলী, ভাষণ ইত্যাদি লক্ষ্য করলে একে তাঁর অন্তরের বিশ্বাস ছাড়া আর কিই বা বলা যেতে পারে? তবে তিনি কারোর ধর্মমতে কখনো আঘাত দিতে চাইতেন না বা নিজে জপ আহ্নিক না করলেও অন্য কাউকে তা থেকে বিরত থাকতে বলতেও তাঁকে কখনো শোনা যায় নি বরং শিবপূজায় কেউ পবিত্রতা লাভ করলে তিনি তাকেই তাঁর আচরণীয় কর্তব্য বলে মনে করেছেন। হরিসাধন গোস্বামীও তাই যথার্থই মন্তব্য করেছেন, ভারতীয় সংস্কৃতির পটভূমিকায় তথ্য ও সত্যের বিন্যাসে এক নতুন জাতির উন্মেষের পরিকল্পনা ছিল স্বামী বিবেকানন্দের। তিনি বাস্তব সম্মত ভাবেই পথনির্দেশ করে বলেছিলেন, ভারতের মানুষের জন্য চাই বৈদান্তিক মেধা আর ব্যবহারিক আচার আচরণে ইসলামের সৌন্দর্য ভরা সামাজিক বাস্তবতা। বিদ্যাসাগরও ঐ একই পথের পথিক। তিনি নিজের ধর্ম বা স্বভাবের ধর্মকে শ্রদ্ধা করে অপরের মতামতকে আঘাত না করার যে বোধগম্য যুক্তিশীলতার দর্শন দিয়েছিলেন তাতে যেন সেই অশোকস্তম্ভের বাণীই পুনরায় উচ্চারিত হয়েছে পরিবর্তিত যুগের প্রয়োজনে।

আবার শ্রাদ্ধাদি কর্মেও বোধ হয় ঈশ্বরচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল। কারণ বিশ্বাস না থাকলে শুধুমাত্র সমাজের লোকাচারের ভয়ে কোন কিছুকে স্বীকার করে নেওয়া তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। এই বিষয়ে তাঁর ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রই লিখছেন, জননী ভগবতী দেবী ফাল্গুন ও চৈত্রমাস ব্যাপী কাশীবাস করে ভয়ঙ্কর বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হয়ে অবশেষে ১২৭৭ সনের চৈত্র সংক্রান্তিতে ইহলোক ত্যাগ করেন ও সেই উপলক্ষে অগ্রজ বিদ্যাসাগর মশাই "দশাহে যথাশাস্ত্র কলিকাতার অতি কাছে কাশীপুরের গঙ্গাতীরে চন্দনধেনু করিয়ে ঊর্দ্ধদৈহিক পারলৌকিক কার্য সম্পাদন করেন।" শুধু তাই নয় হিন্দুশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী মায়ের প্রতি শোক প্রদর্শনার্থে একটি বছর অশৌচ পালন করেন। নিরামিষ রান্নাও স্বপাকে ভক্ষণ করেন টানা একটি বছর। আর এই আহার ছিল মাত্র এক সন্ধ্যাকালে।

আবার মাতৃশ্রাদ্ধের মত পিতৃশ্রাদ্ধও তিনি সম্পূর্ণ করেনও "দশাহে যথাশাস্ত্র ঊর্দ্ধদৈহিক কৃত্য সমাধা করেন। পরে এক সময়ে কাশী আগমন করিয়া পিতার আদেশ প্রতিপালন করিতে (কথামত ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে) বিস্মৃত হন নাই।" কিন্তু একে তাঁর পিতার আদেশের ফল বলে মেনে নিলেও মাতার ক্ষেত্রে কি বলব? সে ক্ষেত্রেও কি কোন আদেশ ছিল? অন্ততঃ সে'রকম কোন প্রমাণ ত আমাদের হাতে আসে নি। তাছাড়া শ্রাদ্ধাদি কর্মের প্রতি বিশ্বাস ছিল বলেই কি তিনি কারোর শ্রাদ্ধের উদ্দেশে প্রদত্ত দান নিতেও কুণ্ঠা-বোধ করতেন না? আমাদের আলোচনার গতি প্রকৃতিটিকে অনুসরণ করলেই একথার সত্যাসত্য ধরা পড়বে।

তথাপি তিনি যে দেশাচারের দাস ছিলেন না সেকথা সত্য। বিদ্যাসাগর মশাই নিজেই লিখেছেন, "ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্বচনীয় মহিমা··· তুই ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিতেছিস্, ধর্ম্মের মর্ম্ম ভেদ করিতেছিস্, ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিতেছিস্। তোর প্রভাবে শাস্ত্র অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে। অধর্ম্মও ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে। সর্ব্ব ধর্ম্মবহিষ্কৃত যথেচ্ছাচারী দুরাচারেরাও তোর অনুগত থাকিয়া কেবল লৌকিক রক্ষাগুণে সর্ব্বত্র সাধু বলিয়া গণনীয় এবং আদরণীয় হইতেছে। দোষস্পর্শ-শূন্য সাধু প্রকৃতির পুরুষেরাও তোর অনুগত না হইয়া, কেবল লৌকিক রক্ষায় অযত্ন প্রকাশ ও অনাদর প্রদর্শন করিলেই সর্বত্র নাস্তিকের শেষ হইতেছেন।"

অথবা "আমি লোকাচারের দাস নহি" ভাবটিকে ব্যক্ত করতে গিয়েও অন্যত্র বলেছেন, "হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম্ম, আর যেন সেদেশে হতভাগা অবলা জাতি জন্মগ্রহণ না

করে। হা অবলাগণ, তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ বলিতে পারি না।"

আসলে বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি ভঙ্গিটিই যে ছিল আধুনিক সে কথা বলার কোন অপেক্ষা রাখে না। স্বয়ং ভাষাচার্য ডঃ সুকুমার সেন মশাই মন্তব্য করেছেন, যে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে আমাদের মধ্যে যে ইতিহাস সম্পর্কে সচেতনতা দেখা দিয়েছে সে প্রসঙ্গে তিনজনের নাম করা যেতে পারে—বিদ্যাসাগর, রামমোহনও রবীন্দ্রনাথ। তবে "আধুনিকতম" হলেন বিদ্যাসাগর। আবার রবীন্দ্রনাথও মন্তব্য করেছেন—

"সেই বড় যুগে তাঁর জন্ম, যার মধ্যে আধুনিক কালেরও স্থান আছে, যা ভাবীকালকে প্রত্যাখ্যান করে না। যে গঙ্গা মরে গেছে তার মধ্যে স্রোত নেই, কিন্তু ডোবা আছে : বহমান গঙ্গা তার থেকে সরে এসেছে, সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ। এই গঙ্গাকেই বলি আধুনিক……এইজনই বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক।" তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কর্মপ্রণালীর জন্যই তিনি আধুনিক, সে' বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তাই সহবাস সম্মতির আইনের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করে তিনি যখন "Religious usage"-এর ওপর জোর দিলেন তখন তা নিয়ে গভীর বাক্‌-বিতণ্ডার সৃষ্টি হল—

I should like the measure to be so framed as to give something like an adequate protection to chid-wives with out in any way conflicting with any religious usage I would propose that it should be an offence for a man to consummate marriage before his wife has had her first menses…such a law would not only serve the interests of humanity…but would, so far from interferning with a religious usage, enforce a rule laid down in the sastras."

কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই দেখা যাবে বিদ্যাসাগর মশাই ধর্মশাস্ত্রকে এক্ষেত্রে নারীর মর্যাদা বা জীবনের স্বার্থেই ব্যবহার করেছেন, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। তিনি বিধবা বিবাহের সময় যেমন ব্যবহার করেছেন তেমনি এবারেও "Religious usage"-এর মাধ্যমে ধর্মসংস্কারকে মানতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, যে "যদিও এই সকল কারণে আমি বিলের সমর্থন করিতে অপারগ, তথাপি প্রচলিত কোন ধর্ম সংস্কারের প্রতিকূলাচরণ না করিয়া এমন কোন আইন হউক, যাহাতে বালিকা-স্ত্রীগণ সমুচিত আশ্রয় প্রাপ্ত হয় তাহাতে আমি সম্পূর্ণ অভিলাষী।" অতএব তাঁর সিদ্ধান্ত এই যে স্ত্রী নারীত্ব প্রাপ্ত হবার পূর্বে তৎসহবাস দণ্ডণীয় অপরাধ বলে নির্দিষ্ট হোক।

আবার যুক্তিবাদী মানসিকতার অধিকারী ছিলেন বলে অন্ধ ছুৎমার্গেও অবিশ্বাসী ছিলেন বিদ্যাসাগর মশাই। স্বয়ং হরপ্রসাদ শাস্ত্রীই লিখছেন, একদিন সকালে উঠিয়াই শুনি মেয়েমহলে খুব সোরগোল উঠিয়াছে। ওমা এমন ত কখনও শোনা যায় নি। বামুনের ছেলে অমৃতলাল মিত্তিরের পাত থেকে রুইমাছের মুড়োটা কেড়ে খেয়েছে। কেউ বলল ঘোর কলি। কেউ বলল—সব একাকার হয়ে যাবে, কেউ বলল, জাতজন্ম আর থাকবে না। শেষে জানা গেল অমন ব্যক্তিটি আর কেউ নন স্বয়ং বিদ্যাসাগর।

আসলে মানুষকে ভালবাসাই ছিল বিদ্যাসাগরের জীবনের আসল ধর্ম। তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থেই কর্মযোগী। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণও তাই নিজে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন বিদ্যাসাগরের বাড়ী, গিয়ে বলেছিলেন, "তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম। সত্ত্বের রজঃ। সত্ত্বগুণ থেকে দয়া হয়। দয়ার জন্য যে কর্ম করা যায়, সে রাজসিক কর্ম বটে—কিন্তু এ'রজোগুণ সত্ত্বের রজোগুণ, এতে দোষ নাই। শুকদেবাদি লোকশিক্ষার জন্য দয়া রেখেছিলেন—ঈশ্বর বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য। তুমি অন্নদান বিদ্যাদান করছ এও ভাল। নিষ্কাম-ভাবে করতে পারলেই এতে ভগবান লাভ হয়।"

কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে উক্ত বা শ্রীসুবোধ চৌধুরী লিখিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগর' নামক গ্রন্থে এই বিষয়টি নিয়ে যে আলোক-পাত করা হয়েছে তাতে দেখা যাবে, যে ঠাকুর কোথাও কিন্তু বিদ্যাসাগরকে সরাসরি ভাবে আস্তিক বা ধর্মবিশ্বাসী (ঠাকুর ধর্মবিশ্বাসী বলতে যা বুঝতেন) বলে অভিহিত করেন নি। তবে বিদ্যাসাগরের বড় ভাল লেগে গিয়েছিল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথাগুলি, বিশেষতঃ ব্রহ্ম অনুচ্ছিষ্ট কথাটি। এ থেকেও তাঁর ধর্ম সম্পর্কে একটি আকুলতার কথা প্রমাণিত, যে আকুলতা প্রমাণিত তাঁর অখিলবন্ধুদিনের কণ্ঠোচ্চারিত গানের প্রতি আকর্ষণে—

(ক) কোথায় ভুলে রয়েছে ও নিরঞ্জন নির্ণয় কর্বে রে কে,
তুমি কোনখানে যাও কোথায় থাক রে, মন অটল হয়ে
কোথায় ভুলে রয়েছে...... ।

(খ) তুমি আপনি নৌকা আপনি নদী, আপনি দাড়ি, আপনি মাঝি,
আপনি হও যে চড়ন দারজী, আপনি হও যে নায়ের কাছি,
আপনি হয় হে হাইল বৈঠা।

(গ) তুমি আপনি মাতা আপনি পিতা,
আপনার নামটি রাখব কোথা, সে নাম হৃদয়ে গাঁথা
আমার গোসাঞি চাঁদ বাউলে বলে সে নাম ভুলব না রে প্রাণ
গেলে।

(ঘ) তুমি আপনি অসার আপনি হও সার,
আপনি হওরে নদীর দুধার, আপনি নদীর কিনারা,
আমি অগাধ জলে ডুব দিতে যাই সে নাম ভুলব নারে প্রাণ
গেলে।

(ঙ) আপনি তারা আপনি সারা, আপনি জরা আপনি মরা,
আপনি হও সে নদীর পাড়া, আবার আপনি হও সে
শ্মশান কর্তা গো
আপনি হও সে জলের মীন ও নিরঞ্জন তোর কোথায় গো
সাকিম
আপনি ভেবে চিন্তে হলেম ক্ষীণ।

আবার রামকৃষ্ণের কণ্ঠোচ্চারিত মাতৃনামেও মুগ্ধ হয়েছেন পণ্ডিত—
কে জানে কালী কেমন

অথবা, ভাবিলে ভাবের উদয় হয়
যেমন ভাব তেমনি লাভ মূলে সে প্রত্যয়।

আসলে হোক না তিনি মাটির মা তবু মায়ে ছেলের সম্পর্কটি ত আর অলৌকিক নয়। তাছাড়া বিদ্যাসাগর প্রকৃত অর্থেই ছিলেন মাতৃভক্ত। মা বাবাই ছিলেন তাঁর কাছে আসল জ্যান্ত দেবতা। তাই মৃত্যুর সময়েও তিনি তাঁর বুকের ওপরে টেনে নিয়েছিলেন জনক-জননীর সেই ছবি দুটি। তাই অখিলানন্দন অথবা শ্রীরামকৃষ্ণের মুখোচ্চারিত ঐ নামেও যে তাঁর মাতৃ-পিতৃ ভক্তি অলৌকিক রসের ইন্ধন পায়নি সেকথা কে বলতে পারে? (যে কারণে গান শুনতে তিনি কেঁদে চলেছিলেন বলে উল্লিখিত হয়েছে)। তবে আমাদের আলোচনার ধারাটিকে মনে রাখলে একে তাঁর ঈশ্বরভক্তিও বলা যেতে পারে। সবদিক থেকে বিচার করে অনেকেই তাঁকে 'আস্তিক' বলে মনে করেছেন ও সেই আস্তিকতা তাঁর 'বোধোদয়' গ্রন্থ, অখিলানন্দীনের গান, ব্রাহ্মসভায় যোগদান, প্রেমোদ্দীপনী সভায় বক্তৃতা ও আরো অন্যান্য সূত্র ধরে অদ্বৈতবাদী ঈশ্বরীয় ভক্তি বলেই পরিগণিত হয়েছে বেশি। তাই তাঁকে সংশয়বাদী বা অজ্ঞেয়বাদী কিছুতেই বলা যাবে না বরং সে' তুলনায় বলা যেতে পারে তুষ্ণীবাদী, যা আবার মাঝে মাঝেই প্রকাশ্যে ব্যক্ত হয়েছে অন্তরের বিশ্বাসের স্বাভাবিক প্রতিফলনের সূত্র ধরেই।

আবার জোতিষশাস্ত্রেও বোধহয় বিদ্যাসাগরের বিশ্বাস ছিল। কারণ আত্মচরিতের এক জায়গায় তিনি নিজেই বলেছেন, "জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনা অনুসারে বৃষরাশিতে আমার জন্ম হইয়াছিল। আর সময় সময় কর্ম দ্বারাও

'এঁড়ে গরুর লক্ষণ আমার আচরণে বিলক্ষণ আবির্ভূত হইত।" কারণ বৃষ-রাশির জাতক বড়ই একগুঁয়ে হয়। বিদ্যাসাগরও তাই ছিলেন।

আবার ডঃ সুবোধ চৌধুরীর গ্রন্থ থেকে আর একটি নতুন তথ্য জানা যায়। অংশটি পড়লে বোঝা যায় যে বিদ্যাসাগর মশাই যোগসাধনেও বোধহয় বিশ্বাসী ছিলেন। কারণ তিনি লিখেছেন প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ যোগসাধন পক্রিয়ার দ্বারা আসন থেকে ধীরে ধীরে শূন্যে উঠে চলেছেন। এদৃশ্য বিদ্যাসাগর মশাইও স্বচক্ষে দেখেছেন। কোন গল্পকথা তিনি শোনেন নি। এমনকি এই দৃশ্য দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ও তাঁর দুই বন্ধুও এ'ব্যাপারে নেমে পড়লেন। ঠনঠনে কালীবাড়ি থেকে সংস্কৃত কলেজ পর্যন্ত নিঃশ্বাস বন্ধ করে যাওয়া আসা অভ্যেস করতে লাগলেন। জানা যায় শেষ বয়সেও তিনি নাকি এই অভ্যেস অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। কিন্তু যদিও একে তাঁর শরীর সুস্থ রাখার একটি পদ্ধতি বলে ধরা হয় তাহলেও যে তিনি যোগীপুরুষ প্রেমচন্দ্রের সেই যোগসিদ্ধ অবস্থাটিকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিলেন তার মূলেও কি তাঁর যোগাভ্যাসের প্রতি বিশ্বাস প্রমাণিত হয় না?

অথচ এই বিদ্যাসাগরকেই আমরা দেখেছিলাম তিনি গায়ত্রী জপ থেকে নিজেকে বিরত রেখেছিলেন। স্বয়ং শম্ভুচন্দ্রই লিখেছেন—

"বাল্যকালে সন্ধ্যার ক্রমগুলি প্রকাশ্যরূপে দেখাইতেন। লোকে জানিত যে……মহাশয়ের সন্ধ্যাভ্যাস আছে; কিন্তু সন্ধ্যা সমস্ত বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সন্দেহপ্রযুক্ত এক দিবস কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পিতৃব্য তাঁহাকে বলিলেন, আমরা সন্ধ্যা ভুলিয়া গিয়াছি বিশেষতঃ আমরা বিষয়ীলোক, তুমি সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছ তোমার শুদ্ধ হইবে অতএব একবার সন্ধ্যাটি তুমি আবৃত্তি কর, আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। তিনি সন্ধ্যা ভুলিয়া গিয়াছেন কিছুই বলিতে পারিলেন না, পিতৃব্য পিতৃদেবকে বলিলেন যে ঈশ্বর সন্ধ্যা সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছে মিথ্যা কেবল হাত নাড়াদি কার্য করিয়া থাকে।"

আবার বিদ্যাসাগর মশাইয়ের মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারেও লিখিত হয়েছে—

"বিদ্যাসাগরের বংশের নিয়ম ছিল পিতা, মাতা, পিতামহ বা পিতামহী মন্ত্রদীক্ষা দিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা পুত্রকে দুই একবার মন্ত্র দিবার প্রস্তাব করিয়া বড় সুবিধা বিবেচনা করেন নাই। সুতরাং তিনি সে বিষয়ে ক্ষান্ত হয়েন। পরে তাঁহার জননী বিদ্যাসাগরকে মন্ত্রদিবার প্রস্তাব করেন। বিদ্যাসাগর তা বিবেচনা করিয়া লইব বলিয়া স্বীকার করেন। একদিন পিতামহী পীড়াপীড়ি করাতে বিদ্যাসাগর মন্ত্র গ্রহণের একান্ত অব্যাহতি নাই ভাবিয়া পিতামহীকে নানা যুক্তি প্রদর্শন করিবার প্রয়াস পান। মন্ত্রগ্রহণে বিদ্যাসাগরের ইচ্ছা বা মত নাই বুঝিয়া পিতামহী আর মন্ত্র লইবার কথা বলেন নাই।"

লক্ষণীয় বিদ্যাসাগর মশাই তাঁর পিতাকে ও পিতামহীকে নানা কথা বোঝালেও মাতা ভগবতী দেবীকে কিন্তু সেরকম কিছুই বলেন নি বরং বিবেচনা করে দেখবার সময় চেয়েছিলেন মাত্র। এ'ক্ষেত্রে আমাদের ধারণা ভগবতী দেবী যদি আর একবার অন্তত: বলতেন তবে তিনি নিশ্চয়ই মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণে আর কোন অজুহাত দেখাতেন না। অবশ্য সে'রকম মনের ইচ্ছা ও মায়ের আদেশের কাছে নিজের যুক্তিবোধকে বিসর্জন দিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা থাকলে প্রথমবারেই যে তিনি মায়ের কথা রাখতেন সে'কথাও সত্য। অবশ্য কেউ কেউ বলবেন যে-তাঁর জন্মের পর ঠাকুর্দা রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় যে শিশুর কোমল পেলব জিহ্বায় লাল আলতা দিয়ে লিখে দিয়েছিলেন তান্ত্রিক বীজমন্ত্র ও নির্দেশ দিয়েছিলেন কেউ যেন একে মন্ত্র না দেন, সেই কারণেই হয়তো আর তিনি দীক্ষা নিতে রাজি হন নি। এমনকি মায়ের আদেশ সত্ত্বেও না। অবশ্য পরবর্তী কালে বিদ্যাসাগর মশাই ঘটনাটিকে নেহাৎ অমূলক বলেই উল্লেখ করেছেন, আর বিচার করে দেখলে তা এক অর্থে ঠিকও। কারণ পিতামহের আদেশ যদি থেকেও থাকে তাহলে তাঁর মাতা, পিতা পিতামহী প্রমুখ আত্মীয় স্বজনেরাই বা কেন তাঁকে দীক্ষা গ্রহণে পীড়াপীড়ি করবেন?

কিন্তু তাহলে তিনি দীক্ষা নিলেন না কেন? আমাদের অনুমান এও এক অর্থে তাঁর মাতৃপিতৃ ভক্তি বা ধর্ম ভক্তিরই নামান্তর মাত্র। কারণ ব্রাহ্মণ হয়ে যিনি গায়ত্রীই জপতেন না, তিনি আবার দীক্ষা নিয়ে আহ্নিকই বা করবেন কি ভাবে? দীক্ষা না নেওয়া এক জিনিস, কিন্তু নিয়ে না মানাটা ত আরো অন্যায়। সুতরাং ঈশ্বরের সত্তায় অবিশ্বাসী হয়ে নয় বরং বিবেকের তাড়নাতেই তিনি দীক্ষা নিলেন না। আর গায়ত্রী না জপলেই বা ক্ষতি কি হল? গায়ত্রী না জপলেই যে ঈশ্বরকে মানেন না এমন ত কোন কথা নেই। এমন বহু ব্রাহ্মণই ত থাকেন যাঁরা গায়ত্রী জপেন না বা ত্রিসন্ধ্যা করেন না অথচ মনে মনে ঈশ্বরের সত্তায় বিশ্বাসী। বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। তিনি চিঠির ওপরেও 'শ্রী শ্রী হরিশরণম্' কথাটি লিখতেন। দেহেও উপবীত ধারণ করতেন। আর এ'নিশ্চয়ই তাঁর লোকাচারের দাসত্ব নয়। কারণ বিদ্যাসাগর সে ছাঁচেই গড়া ছিলেন না।

আবার সত্যের প্রকারভেদ সম্পর্কেও তাঁর বক্তব্য হল, সত্যের কোন প্রকার ভেদ থাকতে পারে না। এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই লিখেছেন—

"ধরা যাক ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ছাত্রেরা লজিক, অথবা দর্শন অধ্যয়ন করিল। এখন যদি তাহারা বলে, "লজিকের পাশ্চাত্য থিয়োরীও সত্য, হিন্দু থিয়োরীও সত্য, অথচ যদি তাহারা উভয়ের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান না পায়, এবং না পাইয়া এক ভাষার সত্য অন্য ভাষায় প্রকাশ করিতে না

পারে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, হয় তাহারা বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই, না হয়, যে ভাষায় তাহারা নিজেদের ভাব প্রকাশ করিতে অক্ষম, সেই বিষয়ে তাহাদের জ্ঞান অল্প…।"

সেইকারণে ছাত্রদের মিলের লজিক পড়ানোরও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন—

"বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শন যে ভ্রান্ত দর্শন, এ সম্পর্কে এখন আর মতভেদ নাই। মিথ্যা হইলেও হিন্দুদের কাছে এই দুই দর্শন অসাধারণ শ্রদ্ধার জিনিস। সংস্কৃতে এগুলি যখন শিখাইতেই হইবে, ইহাদের প্রভাব কাটাইয়া তুলিতে প্রতিবেধক রূপে ইংরাজীতে ছাত্রদের যথার্থ দর্শন পড়ানো দরকার।" কেননা তাঁর মতে বার্কলের 'Inquiry' বেদান্ত বা সাংখ্যের মত একই মানসিকতা পোষণ করে আসছে। সুতরাং লজিক পড়ানো ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এই কারণেই প্রমথনাথ বিশি তাঁকে একান্তভাবেই বাস্তবধর্মী বা প্র্যাকটিকাল বলতে প্রয়াসী।

আবার সম্পাদক মোয়াটকে লেখা একটি রিপোর্টেও তিনি স্মৃতির অষ্টা-বিংশতি তত্ত্বকে শিক্ষার পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দিয়ে দিলেন। কারণ তাঁর মতে যা পুরোহিতের শিক্ষার বিষয় তাকে ছাত্রদের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা একেবারেই নিরর্থক। ধর্মের লেশ মাত্রও শিক্ষার ক্ষেত্রে থাকা উচিত নয়। আবার ন্যায় শ্রেণীর পাঠ্যক্রম সম্পর্কেও তাঁর বক্তব্য হল—

"……ছাত্রদের ইংরাজী ভাষাজ্ঞান অনায়াসেই তাহাদিগকে ইউরোপের আধুনিক দর্শন শাস্ত্রগুলির বিষয়সমূহ অধ্যয়ন ও হৃদয়ঙ্গম করিতে সাহায্য করিবে। তাহারা পাশ্চাত্ত্য দর্শনশাস্ত্রের সহিত তাহাদিগের স্বদেশীয় দর্শন শাস্ত্রের তুলনা করিতে সক্ষম হইবে।"

এর পাশাপাশি আবার তাঁর মৌলিক সাহিত্য কর্মগুলিকেও আমাদের লক্ষ্য করতে হবে। কারণ সে'সব সাহিত্য কর্মে ও ঈশ্বর প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে নানাভাবে। যেমন 'আখ্যান মঞ্জরী' গ্রন্থের তৃতীয় ভাগের 'যতো ধর্ম ততো জয়ঃ' গল্পটিতেই লিখিত হয়েছে, "ধর্মপথে থাকিলে অবশ্যই সুখ, সম্পত্তি ও সৌভাগ্য লাভ ঘটে, ধার্মিক ব্যক্তিকে যদিও কোন কারণে আপাততঃ কষ্ট ভোগ করিতে হয়, কিন্তু যদি তিনি ধর্মপথ হইতে বিচলিত না হন, চরমে জয় লাভ স্থির সিদ্ধান্ত।" এখানেও 'ধর্মপথ' অর্থে ন্যায় পথের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। আবার 'পুরুষ জাতির নৃশংসতা' গল্পে ধর্মকে দেবতা হিসাবেই দেখানো হয়েছে। ইয়ারিকো ও ইঙ্কল উভয়েই সেখানে ধর্মসাক্ষী করেই পরিণয় পাশে আবদ্ধ হয়েছে।

তাই 'আখ্যান মঞ্জরীর' তিনটি ভাগে ধর্ম সম্পর্কিত যে তিনটি আখ্যান তিনি সংযোজিত করেছেন তা থেকে সমালোচক সিদ্ধান্তে এসেছেন যে বিদ্যাসাগরের মনে ধর্মবিশ্বাসের প্রবণতা বিদ্যমান না থাকলে কখনই এবংবিধ ছবি আঁকতেন না। যেমন প্রথম আখ্যানে এক বিধবার বক্তব্যে জানা যায় "পরস্বহরণ নিতান্ত অপকর্ম করিয়া পৃথিবীর সমস্ত সম্পত্তি পাওয়া অপেক্ষা ধর্মপথে থাকিয়া, দুঃখে কাল যাপন করা ভাল।" আবার দ্বিতীয় আখ্যানেও এক বৃদ্ধ বিধবার ন্যায় পরায়ণতা ও ধর্মবোধই প্রকাশিত। গল্পগুলি এ'ভাবেই সাজানো। আবার দ্বিতীয় ভাগে 'ধর্মতঃ' শব্দে আদর্শের কথাই ব্যক্ত। এই ভাগের একটি বিশেষ গল্প "ঐশিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস"। এখানে একটি পিতৃমাতৃহীন বালক ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখেছিল বলেই একটি কাজ করতে পেরেছিল। বালকটি বলেছিল, ঈশ্বর এই পৃথিবীর কোনও স্থানে অবশ্যই আমার জন্য কোন ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, এ'বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আমি কেবল সেই ব্যবস্থার অন্বেষণ করিতেছি।" সুতরাং এই বিশ্বাস বিদ্যাসাগরের না থাকলে এত দরদ দিয়ে ঐ পিতৃমাতৃহীন বালকের চিত্র আঁকা সম্ভব হত কি ?

এ'ছাড়া তাঁর 'ভূগোল-খগোল-বর্ণনম্'গ্রন্থেও ঈশ্বর ভক্তির পরিচয় বিদ্যমান—

যৎক্রিড়া ভাণ্ড বদ্ভাতি ব্রহ্মাণ্ডমিদ্মদ্ভুতম্।
অসীমমহিমানং তং প্রণমামি মহেশ্বরম্ ॥

আবার যুবক বয়সেই তিনি রচনা করেছিলেন 'বাসুদেব চরিত'। শ্রীমদ্-ভাগবতের আখ্যান ভাগ অবলম্বনেই এটি রচিত—

"অনন্তর অষ্টম মাস পূর্ণ হইলে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমীর অর্ধরাত্র সময়ে ভগবান ত্রিলোকনাথ দেবকীর গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইলেন। তৎকালে দিক্সকল প্রসন্ন হইল, গগনমণ্ডলে নির্ম্মল নক্ষত্রমণ্ডল উদিত হইল, গ্রামে নগরে নানা মঙ্গল-বাদ্য হইতে লাগিল। সাধুগণের আশয় ও জলাশয় সুপ্রসন্ন হইল। দেবলোকে দুন্দুভি ধ্বনি হইতে লাগিল। সিদ্ধচারণ কিন্নর গন্ধর্বগণ গীতস্তুতি করিতে লাগিল। বিদ্যাধরীগণ অপ্সরাদিগের সহিত নৃত্য করিতে লাগিল। দেব ও দেবর্ষিগণ হর্ষিত মনে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল। মেঘ সকল মন্দ মন্দ গর্জন করিতে লাগিল।"

এই 'বাসুদেব চরিত'-এরই আর এক অংশ হল এই—

'…এইরূপে কৃষ্ণ পরামর্শানুসারে দেবরাজের পূজা পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনবাসীরা গোবর্ধন পর্বতের অর্চনার বিধি সংস্থাপন করিলেন এবং মূর্তিমান দেবদর্শন করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, দেখ ভাই আমরা এতাবৎকাল পর্যন্ত ইন্দ্রের পূজা করিয়াছিলাম কখনও দর্শন পাই নাই, কিন্তু

অদ্য একবার মাত্র অর্চনা করিয়া গিরিদেবের দর্শন পাইলাম অতএব এতদিন আমরা এমন প্রত্যক্ষ দেবতার উপেক্ষা করিয়া বৃথা কালক্ষেপ করিয়াছি আজ কৃষ্ণ হইতে আমাদের ভ্রম নিবারণ হইল। কৃষ্ণ দেখিতে বালক বটে কিন্তু বুদ্ধিতে আমাদের পিতামহ। এইরূপ নানাবিধ কথোপকথন করিয়া কৃষ্ণ গুণগান করিতে লাগিলেন এবং নৃত্যগীতাবসানে পুনরায় পর্বত প্রদক্ষিণ করিয়া কৃষ্ণের সহিত বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন।

ত্যজিয়া ইন্দ্রের পূজা পর্ব্বতে পূজিলে।
শুনিয়া ইন্দ্রের মনে ক্রোধ উপজিল॥

এইবার সিদ্ধান্ত নেবার পালা। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে ঈশ্বরচন্দ্রের মনে ঈশ্বর সম্পর্কে যে একটি মোটামুটি প্রত্যয় বাল্যকাল থেকেই ছিল সে'বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, যে কারণে কৃষ্ণকমলের মত মানুষও (যিনি বলেছিলেন বিদ্যাসাগর যে নাস্তিক ছিলেন সে কথাটা বোধ হয় তোমরা জান না) শেষপর্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্রের ধর্মবোধকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিপাকে পড়েছেন, বলেছেন, "চিঠির ওপরে শ্রীশ্রী হরিশরণম্ লিখলে কেউ নাস্তিক হন কিনা সে কথা আমার জানা নেই।"

আসলে বিদ্যাসাগরের চরিত্রটিই আমাদের কাছে রয়ে গেছে আজও রহস্যময়। তিনি একদিকে যেমন জীবনের নানাক্ষেত্রে ও সাহিত্যকর্মের বিবিধ প্রসঙ্গেই তাঁর আস্তিকতার ভাবটিকে মুদ্রিত করে দিয়েছেন তেমনি অপরদিকে আবার প্রবল যুক্তিবাদের দ্বারাও নিজেকে চালিত করতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করেন নি। তাই মাঝে মাঝেই তাঁকে দোলাচলতার শিকার হতে দেখা গেছে তবে বৈরাগ্যের দ্বারা যে তিনি প্রভাবিত হতে চান নি সেকথা সম্পূর্ণ সত্য। কারণ ধর্মের কথা মাঝে মাঝে বললেও (বেশ স্পষ্টভাবেই) কর্মের দ্বারাই তাঁকে চালিত হতে দেখা গেছে, ধর্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠানের দ্বারা নয়। মানুষের সেবাই ছিল তাঁর কাছে আসল ধর্ম। তাই কখনো কখনো ঈশ্বরের বিরুদ্ধেও তাঁর ক্ষোভ প্রকাশিত হতে দেখা গেছে। যেমন একবার ধর্মবিষয়ক আলোচনা করতে গিয়েই তিনি বলেছিলেন—

ঈশ্বর ঈশ্বর করে লাভটা কি হবে? চেঙ্গিস খাঁ লুঠপাট শুরু করায় ফলে যখন প্রচুর লোক বন্দী হল, তখন তিনি বললেন, এত লোককে ভরণপোষণ করবে কে? সুতরাং হত্যা করার আদেশই শিরোধার্য হল। অতএব ঈশ্বর যদি প্রকৃতই থাকবেন, তিনি যদি সকল প্রাণীর রক্ষাকর্তা বলেই নিজেকে প্রকাশ করবেন তাহলে এদের প্রতি কি এতটুকুও কি তিনি নজর দিতে পারলেন না? মানুষ এতে ভগবানের কাছ থেকে কি এবং কতটুকুই বা পেল?

কিন্তু মনে রাখতে হবে এ'শুধুমাত্রই মানবপ্রেমিক বিদ্যাসাগরের অন্তরের ক্ষোভমাত্র। কারণ ঈশ্বরকে ত তিনি নিজেই 'বোধোদয়'-এর দ্বিতীয় সংস্করণে সকল প্রাণীর 'আহারদাতা ও রক্ষাকর্তা' বলেই চিহ্নিত করেছিলেন। তবে তিনি যে তুষ্ণীবাদী ছিলেন বা ধর্মবিষয়ে নিজের মতামতকে কোথাও ঢাক পিটিয়ে বলে বেড়ান নি সেকথা ত পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, শুধু তার সঙ্গে এখানে আর একটু যোগ করে বলা যায় যে তিনি একবার নিজেই বলেছিলেন. পৃথিবীর প্রারম্ভ থেকে ধর্ম বিষয়ে যে তর্কবিতর্ক চলে আসছে, তার কোনদিনই শেষ হবে না, পৃথিবী যতদিন থাকবে এইরূপ তর্কবিতর্কও ততদিন বর্তমান থাকবে, অতএব সে'দিকে গিয়ে আর কাজ নেই। কারণ—

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্ ।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥

তাছাড়া ধর্মের আর এক অর্থ যদি হয় কর্তব্য, যে কথা তিনি নিজেই বলেছেন কর্তব্যই ধর্ম, তাহলেও বিদ্যাসাগরকে আমাদের ধার্মিক না বলে উপায় নেই। কারণ তিনি যেমন তাঁর উপার্জিত অর্থ দিয়ে বহু মানুষের মাসহারার ব্যবস্থা করেছিলেন তেমনি অপরদিকে বালিকাদের শিক্ষার জন্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন, সাহিত্য সেবা, দুর্ভিক্ষের সময়ে অন্নসত্রের ব্যবস্থা করা, সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা, বিধবা বিবাহের প্রবর্তন করা এমন কতই না উন্নয়ন মূলক কাজ তিনি করে গেছেন। তাই সমালোচকও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন, তাঁর কর্ম যেন ঔপনিষদিক 'স্বাধ্যায়', যে স্বাধ্যায়ের দ্বারা তিনি ভারতীয় সাধনারই চরম পরিণতিতে পেঁছতে সমর্থ হয়েছিলেন।

তাই একথা ঠিকই যে ঔপনিষদিক ধ্যান ধারণাই যেন তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। উপনিষদের ভাবে প্রভাবিত তিনি 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা' কথাটিকেই যেন নিজের বীজমন্ত্র রূপে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আবার ঈশ্বর বিষয়ক আলোচনাকে সময় নষ্ট বলে অভিহিত করলেও তিনি পরক্ষণেই বলেছেন "তাঁকে জানবার জো নেই, অতএব বৃথা তর্ক অনাবশ্যক।" ঠিক এই কথাটিকেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন অন্যভাবে "ব্রহ্ম অনুচ্ছিষ্ট," (যেটি বিদ্যাসাগরে খুব ভাল লেগে গিয়েছিল) তাঁকে জানবার জো নেই। বেদ বেদান্তের মুনি ঋষিরাই তাঁর রূপের ইতি করতে পারেন না আর সামান্য মানুষ ত কোন ছার। কিন্তু একজনের সঙ্গে আর একজনের পার্থক্য কেবল এইখানেই যে ঠাকুর সেই অনুচ্ছিষ্ট ব্রহ্মকে "অনুচ্ছিষ্ট" বলেও যেখানে তাঁর সাধনা থেকে বিরত হন নি, সেখানে বিদ্যাসাগর সে পথেই যান নি, (যদিও অন্তরে তাঁর যে বিশ্বাস সুপ্তভাবে ছিল সন্দেহ নেই) তাঁর সাধনা যেন অনেকটা রবীন্দ্রনাথের মতই—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়,
লভিব মুক্তির স্বাদ।

আবার বিদ্যাসাগরের ধর্মকে যেন গীতার উপদেশ অনুযায়ীও ব্যাখ্যা করা চলে। কারণ তিনি নিজেই বলেছেন "গীতার উপদেশ অনুসারে চলিলেই ভাল হয়।" আর সেই গীতাতেই বলা হয়েছে—

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্প বিবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ কর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥

তথাপি অনেকেই বিদ্যাসাগর মশাইকে নিরাকারবাদী ঈশ্বরেরই উপাসক বলে অভিহিত করেছেন। অবশ্য তাঁর 'বোধোদয়' গ্রন্থ, প্রেমোদ্দীপনী সভায় বক্তৃতাদান, অখিলবন্ধুনের গান শুনে মনেপ্রাণে মুগ্ধ হওয়া প্রভৃতি বিচার করলে তাঁকে একেশ্বরবাদের অনুগামী বলেই মনে হয়। যেমন আচার্য্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ই লিখেছেন—

নামেতে ঈশ্বরচন্দ্র অতিস্থির মতি
সারল্য ও দৃঢ়তার উদ্দীপ্ত মুরতি
চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মে অতিস্থির মতি
মাতা ও পিতার পদে ভকতি-আরতি
ঐশ্বরিক গুণে ভরা তার পুণ্যরূপ
থাকুক ভারতচিত্তে চির জাগরুক॥

অথবা গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়—

বোধদয়ে নিরাকার জপিবে ঈশ্বর।
বঙ্গের ভবিষ্যবংশ-শিশু নারী নর॥

তবে আমাদের মনে হয় বিদ্যাসাগর আকার না নিরাকারের উপাসক ছিলেন তা নিশ্চয় করে বলবার কোন উপায় নেই যদিও নিরাকারবাদের দিকেই পাল্লা ভারি। তবে একথা ঠিকই যে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে কোথাও অবিশ্বাসী ছিলেন বলে মনে হয় না, আর সে ঈশ্বর প্রেম যে প্রধানতঃ মানবপ্রেমকে ঘিরেই বিকশিত হয়েছিল সে বিষয়েও কোন মতদ্বৈতের অবকাশ নেই। তাই কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকও তাঁর সেই উদার ধর্মের দিকে নজর রেখে বললেন—

তোমার বুকে মঠ বেঁধেছে এক সাথেতে সব,
হিন্দু তুমি বৌদ্ধ তুমি শাক্ত ও বৈষ্ণব।

সকল মানুষকেই যিনি এমন দরদ দিয়ে ভালবাসেন তাঁর থেকে বড় ধার্মিক আর কে? বিদ্যাসাগরও সেই অর্থেই ধার্মিক।

সহায়ক গ্রন্থ

কালিদাস গ্রন্থাবলী—বসুমতী সংস্করণ
কালিদাস সমগ্র—রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন্‌
রবীন্দ্রনাথ ও প্রাচীন সাহিত্য—হরনাথ পাল
কালিদাস—অতুল মুখোপাধ্যায়
প্রাচীন সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাংলার ব্রত—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মেয়েলী ব্রতকথা—সুহাসিনী দেবী
বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস—ডঃ বরুণ কুমার চক্রবর্তী
লোকসংস্কৃতি ঃ নানা প্রসঙ্গ—ডঃ বরুণ কুমার চক্রবর্তী
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত - আনন্দ পাবলিশার্স
লোকজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ—স্বামী সোমেশ্বরানন্দ
আধুনিক কবিতাঃ নিবিড় পাঠ—ধ্রুব মুখোপাধ্যায়
আধুনিক বাংলা কাব্য—দীপ্তি ত্রিপাঠী
কবিতার কলকাতা—অরুণ সেন সম্পাদিত
উল্লিখিত কবিদের কাব্য—কবিতা পাঠ
বাংলা ছোটগল্প—বীরেন দত্ত
বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার—ডঃ ভূদেব চৌধুরী
সাহিত্যে ছোটগল্প—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
ছোটগল্পের কথা—রথীন্দ্রনাথ রায়
উল্লিখিত ছোটগল্প লেখকদের রচনাবলী পাঠ
বিদ্যাসাগর রচনাবলী—দেবকুমার বসু সম্পাদিত
বঙ্গের রত্নমালা—পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
করুণাসাগর বিদ্যাসাগর—ইন্দ্র মিত্র
বিদ্যাসাগর—বিহারীলাল সরকার
বিদ্যাসাগর—চণ্ডীচরণ গুপ্ত
বিদ্যাসাগর—নমিতা চক্রবর্তী
বিদ্যাসাগর চরিত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রসসাগর বিদ্যাসাগর—শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু
বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ—বিনয় ঘোষ
অবিস্মরণীয় মুহূর্ত (বর্ণপরিচয়)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
জীবনসন্ধানী বিদ্যাসাগর—রামরঞ্জন রায়
শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগর—সুবোধ চৌধুরী

সহায়ক গ্রন্থ

মার্কসীয় দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগর—হরিসাধন গোস্বামী
বিদ্যাসাগর—শম্ভুচরণ বিদ্যারত্ন
বাঙালী জীবনে বিদ্যাসাগর—সৌমেন্দ্র নাথ সরকার
সাহিত্য সাধক চরিতমালা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
আত্মচরিত—রাজনারায়ণ বসু
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত অখণ্ড (আনন্দ পাবলিশার্স)
বিদ্যাসাগর—মণি বাগচি
বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—আচার্য সুকুমার সেন।
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বিনয় ঘোষ,
বিদ্যাসাগর চরিত—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।
সমকালে বিদ্যাসাগর—স্বপন বসু